পরিচিতি

শ্রীমল্লিকা মিত্র

মূল্য—এক টাকা

প্রকাশক—শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস
২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিঃ
৯৩এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

উৎসর্গ

পরমপূজনীয়

রায় দীননাথ দে বাহাদুর

দাদামশাই,

আমার লেখার পশ্চাতে আছে সকলের চেয়ে বেশী আপনার উৎসাহ ও প্রেরণা; সেইজন্য আমার এই প্রথম লেখা গল্পের বইখানি ভক্তি ও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আপনাকে উৎসর্গ করলুম।

আমি জানি "পরিচিতি" আর কারোর আদর না পেলেও আপনার আদর থেকে বঞ্চিত হবে না।

কলিকাতা, সপ্তমী পূজা
১০ই আশ্বিন, ১৩৪৮

স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী
মল্লিকা

ভূমিকা

"পরিচিতির" লেখিকা আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিতাই ছিল; কিন্তু তার ছোট ছোট গল্পগুলির উপর চোখ বুলিয়েই দেখলাম যে সেগুলি আমাদের চিরপরিচিত। বইখানির নামকরণ যে ঠিক হ'য়েছে তা' বলাই বাহুল্য।

"পরিচিতির" প্রথম গল্প "ফুলের ভুল" ছোট্ট একটি যূই কুঁড়ির ফুটে উঠে আবার ঝরে পড়ার একটুখানি ইতিহাস; এককোঁটা চোখের জলের মত সেটি করুণ, আবার ভোরবেলার শিশির বিন্দুর মতই ঝলমলে। প্রকৃতির সঙ্গে লেখিকার যে একটা নিবিড় পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছে তার গল্পগুলিতে তা' অস্পষ্ট নয়। "বাঁশীর টানে" গল্পটির সুর পুরাতন হলেও লেখার গুণে তানটিতে নতুনের রেশ পাওয়া যায়। লেখিকার সব ক'টি গল্পতেই একটি মর্ম্মস্পর্শী করুণ সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে; পাঠকের মনটাকে উদাস করে দেয়, কিন্তু এই বয়সের লেখক-লেখিকাদের মধ্যে এদিকে একটা তীব্র নেশা থাকে—এ সবাই জানে। একদিন সবাই ঐ পথ দিয়েই পথ চলা আরম্ভ করে; তাই এই বইখানির সমস্ত রচনা যেন শ্রাবণ প্রভাতের মতই জলসিক্ত, অশ্রুভারাতুর নেত্রের মতই শোকনম্র সকরুণ; কিন্তু

লেখনীর মুখে একটি শিক্ষিত সংযম বর্ত্তমান থাকাতে কিছুই যেন মাত্রা ছাড়াতে পারে নি ; এইটুকুই এই নবীনা লেখিকার বিশেষ কৃতিত্ব।

লেখিকা বয়সে কাঁচা হ'লেও তার লেখনী কাঁচা নয় ; চেষ্টা থাকলে একদিন সাহিত্যিক খ্যাতিলাভ করা এর পক্ষে বিচিত্র হবে না।

কলিকাতা, ৪ঠা আশ্বিন,
মহালয়া

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

সূচী

ফুলের ভুল

ছোট্ট একটি বাগান, তার এক কোণে ছোট্ট একটি যূঁই গাছ। বন্ধুহীন জীবন তার ভাল লাগে না; তার রূপ নেই, তার শ্রী নেই ব'লে ভগবানের কাছে তার মনোবেদনা জানায়। হঠাৎ কোন এক সুন্দর শুভ প্রাতে তার একটি কুঁড়ি চোখ মেলে চায়, তার ঘুম এখনও ভাঙে নি, তখনও তার মন স্বপ্নরাজ্যের তন্দ্রাজালে জড়িয়ে আছে।

নূতন রাজ্যে এসে, নূতন আলো পেয়ে যূঁইকুঁড়ি দিন দিন বাড়তে লাগলো। দুরন্ত বাতাস এসে তাকে বিরক্ত করে; সে মৃদু প্রতিবাদ জানায়, বাতাস রাগের ভাণ করে ফিরে যায়। যূঁই আবার তাকে ডেকে আনে, বলে,—"ভাই তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, কার সঙ্গে আমি খেলা করবো?"

বাতাস তাকে আদর করে, তার স্নেহশীতল হাত বুলিয়ে দেয় তার সারা গায়ে, কত কথা বলে।

ধীরে ধীরে যূঁই তার কৈশোরের কোঠা ছেড়ে যৌবনের সিঁড়িতে পা দেয়। এখন বাতাস এসে তাকে আদর ক'রতে এলে সে সরে যায়, তাকে ফিরে যেতে বলে। সে দিনরাত কাকে যেন খোঁজে, তার যৌবনের পরিপূর্ণ প্রেম দিয়ে কাকে

কেন পূজা করতে চায়, কিন্তু কেউ আসে না তার সেই পূজার অর্ঘ্য তুলে নিতে। সে থাকে শবরীর মত তার ব্যর্থ প্রতীক্ষা নিয়ে।

একদিন ঘুম থেকে উঠে যূঁই অবাক হয়ে যায়—একি? এ যে সেই! যাকে এতদিন সে কল্পনায় দেখে এসেছে! ওযে তারই দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছে! যূঁই তাকে ভালোবেসে ফেলে; সাজানো অর্ঘ্য তারই কাছে নিবেদন করতে চায় কিন্তু ভয় হয়, যদি গন্ধরাজ সে ডালি উপেক্ষা করে? যদি তাকে ভালো না বাসে!

যূঁইয়ের ভুল ভেঙে যায়—দেখে গন্ধরাজ তারই দিকে চেয়ে হাসে, যেন বলে, "যূঁই, তোমাকে আমার ভালো লাগে—তুমি আমার হবে?"

যূঁই শিউরে উঠে বলে "তুমি আমায় চাও? সত্যি, গন্ধরাজ একি তোমার মনের কথা?"

সেই নিরালা বাগানের একটি কোণে নূতন প্রেমিক প্রেমিকার দিন কেটে যায় হাসি, কথা, গান আর ভালোবাসার স্বপ্নে। গন্ধরাজ নুয়ে এসে ধীরে ধীরে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে যূঁইকে, তার উষ্ণ মধুর পরশ দিয়ে যায় তার সারা গায়ে। পুলকিত যূঁই আত্মহারা হয়ে পড়ে আনন্দের আবেশে, সে তখন ভুলে যায় আলো, ভুলে যায় বাতাস, ভুলে যায় সমস্ত পৃথিবীর কথা; হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দনে কেবল এক অব্যক্ত সুখের

তীব্র পুলকের অনুভূতি জাগে তার অন্তরে ; যূঁই গন্ধরাজের বাহুবন্ধনে সম্মোহিত হয়ে থাকে ক্ষণকালের জন্যে। যখন তার সুখের মূর্চ্ছাঘোর কেটে যায়, কম্প্র কণ্ঠে, সরম জড়িত চোখের ভাষায় গন্ধরাজকে বলে—"গন্ধরাজ, আমার ভয় হয় পাছে তোমায় হারাই।"

গন্ধরাজ তার আরও কাছে এসে বলে—"তা কখনও হতে পারে না, যূঁই, তা কখনও হবে না।"

এমনি করে যূঁইয়ের দীর্ঘ দিনগুলো কেটে যায় গন্ধরাজের প্রণয়ের আলাপে, প্রলাপে, আভাসে, গুঞ্জণে, তার মনে সুখের এক একটা সুগভীর ছাপ রেখে, সুন্দর ছবি এঁকে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অসম্ভবটাই যে সম্ভব হয়ে দাঁড়ায়! গন্ধরাজ সরে যায়, নির্দ্দোষ যূঁইকে সন্দেহ করে, তার প্রেম অস্বীকার ক'রে দূরে সরে যেতে চায়—

যূঁই বোঝায়, কিন্তু সে অবুঝ, কিছুতেই বুঝতে পারে না—তার মুখ ফিরিয়ে নেয় অন্য দিকে, যাতে যূঁই তাকে আর না দেখতে পায়।

যূঁই আশা ছাড়ে না, তার চোখের জলে দিনের পর দিন সে মালা গাঁথে আর ভাবে—সে কি আবার গন্ধরাজকে মালা পরাতে পারবে? তার সুখের ছবিগুলো মনে পড়ে এক এক করে, গন্ধরাজের প্রণয়সিক্ত কথাগুলো তার কানের কাছে এসে ভ্রমরের মত গুণ গুণ করে, তার মুখ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে আনন্দের

উচ্ছ্বাসে—আবার মলিন হয়ে যায় গন্ধরাজের দিকে চেয়ে, হাতের মালাটা শিথিল হয়ে আসে। হায় রে প্রেমমূঢ় মন!

সেদিন সে অতীত দিনের সুখের স্মৃতিতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল মালা গাঁথতে গাঁথতে; স্বপ্নে সে রচনা করেছিল বাসর শয্যা কত রকমের সুগন্ধ ফুলে; গন্ধরাজের গলায় মালা পরাতে গিয়ে তার স্বপ্ন গেল টুটে, তার মালা শিথিল করপল্লব থেকে পড়লো মাটিতে, তার দেহও অবশ হয়ে তারই ওপর পড়লো লুটিয়ে, অতি কষ্টে মালার একটি ফুলে শেষ চুম্বন রেখে মুখ লুকালো মাটিতে, আর উঠলো না। বাতাস দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চলে গেল নদীর বুকে।

তখন অস্তাচলগামী সূর্য্যের রক্তিমচ্ছটায় সারা বাগানে, গাছে গাছে, পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে চলেছে ফাগের খেলা। গন্ধরাজ আলিঙ্গনাবদ্ধ মাধবীকে বলে—"মাধবী, তুমি আমার—তুমি আমার।"

বিপর্য্যয়

ঐ যে পাহাড়টা একা বিরস বদনে ব'সে র'য়েছে চুপটি ক'রে ওর সামনের ঐ ছোট নদীটার দিকে চেয়ে, তার কারণ আছে, সে এক মস্ত কাহিনী!

পাহাড়টার দিকে দেখলে মনে হয়, নদীটার ওপর কি রকম ভ্রূকুটি ক'রছে। নদীটা যখন খিল খিল ক'রে হেসে ওর সামনে দিয়ে কল্লোল তুলে নাচ্‌তে নাচ্‌তে যায় তখন পাহাড়ের অবস্থা দেখলে কষ্ট হবে—বেচারা কি ভয়ানক যন্ত্রণা পায় অন্তরে অন্তরে। তখন তার বিষাদমাখা চোখগুলো রাগে, ঘৃণায় জ্বলে উঠছে, যেন নদীটাকে বলছে—"শয়তানি, তুই আবার হাসছিস্, আমায় ব্যঙ্গ করছিস্? উঃ, ভগবান অনড় করেছেন, নইলে তোর কি শাস্তি যে দিতুম তা আমিই জানি।" এই বলে সবেগে উঠতে যায় নদীকে ধরবার জন্যে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই চিরপক্ষাঘাত-গ্রস্ত আপন পদযুগলের অক্ষমতায় ব'সে ব'সে ঝরঝর করে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে থাকে; ভগবানের প্রতি তাঁর অবিচারের কাতর প্রতিবাদ জানিয়ে। তখন তার অবস্থা দেখলে কেউ না কেঁদে থাকতে পারবে না; সে করুণ দৃশ্য কেউ বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে পারবে না।

পরিচিতি

বর্ষায় নদীটা যত ছল্‌ছল্‌ কল্‌কল্‌ ক'রে উচ্ছল হ'য়ে ঢেউ তুলে হাসতে হাসতে যায়, পাহাড়টার চোখ থেকে অশ্রুর বন্যা ওর সারা দেহ ভিজিয়ে তত প্রবল ধারায় ঝরতে থাকে অবিশ্রান্ত। এর ইতিহাস আছে—কাহিনী আছে—নদী যত হাসে, পাহাড়টা ততই কাঁদে কেন ?

সে অনেকদিন আগেকার কথা। ঐ নদীটা তখন ছিল না। ঐ পাহাড়ের তলায় এসে ঘর বাঁধলো এক সাঁওতাল পরিবার। দুখিয়া, তার স্ত্রী ময়না আর তাদের একমাত্র ছেলে দুই মাসের মঙ্‌লু। তাদের সঙ্গী বা অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল ঐ পাহাড়টা। কাজকর্ম্ম সেরে তারা এসে ওর বুকে বসে কতো সুখ দুঃখের কথা কইত, কতো সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলত !

দুখিয়াদের দিন বেশ কাটে, জমি জমা করেছে, গরু ভেড়াও কতক পোষে। চাষ আবাদ ক'রে যা উপায় হয় তাতেই তাদের দিন চলে যায় হেসে খেলে।

মঙ্‌লু তখন বছর দু'য়েকের হবে। দুখিয়া রোজ দিন মজুরী করতে যেত নিকটের একগ্রামে। একদিন কাজ সেরে খুব খুসী মনে হন্তদন্ত হ'য়ে ঘরে ফিরে ময়নাকে ডেকে বল্‌লে— "ওরে ময়না, শোন, আজ একটা মস্ত সুখবর দেব তোকে। পাশের গ্রামের হারুয়া আর রামুয়া সহরে যাচ্ছে চাকরি করতে ; কলের কাজ, অনেক মাইনে, মাসে ১৪ টাকা করে দেবে,

বুঝেছিস? আমিও যাব তাদের সঙ্গে, কথা দিয়েছি—তুই রাজী আছিস ত?"

ময়না বল্‌ল—"বেশ ত, ভাল কথা, কিন্তু আমাদের কি ব্যবস্থা করবি?"

দুখিয়া বল্‌ল—"কেন? তোদের কি ভাবনা, আমার ত কিছু টাকা জমা আছে, তাছাড়া এই ক্ষেতখামার রইল, গরু ভেড়াগুলো রইল, তোদের দুটি প্রাণীর হেসে খেলে চলে যাবে, কি বলিস?"

ময়না রাজী হয়ে গেল। তারপরের দিন দুখিয়া চল্‌ল সহরে কলে কাজ করতে। যাবার সময় ময়না জিজ্ঞাসা করল—"কবে ফির্‌বি?"

"দু'মাস পরে, সাবধানে থাকিস তোরা, মঙ্‌লুকে দেখিস্।" ব'লে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় নিলো দুখিয়া ময়নার কাছ থেকে।

একমাস দু'মাস ক'রে তিনটে বছর কেটে গেছে, কিন্তু দুখিয়া আর ফেরে না; কোনো খবরই নেই তার। ময়না পাশের গ্রামে সর্দ্দারের ঘরে খবর আনতে যায় কিন্তু তার কোনো খোঁজই মেলে না। ময়নার দিনগুলো কাটে আশায় নিরাশায়—চোখের জলে আর দীর্ঘশ্বাসে। কেবল মঙ্‌লুর মুখ চেয়ে তাকে সব কষ্ট সহ্য করতে হয়—তাকে হাসতেও হয়, হাসাতেও হয়; মঙ্‌লুকে যে মানুষ করবার ভার দিয়ে গেছে দুখিয়া।

মঙ্‌লু এখন পাঁচ বছরের কিশোর—নিটোল সুন্দর তার গড়ন, কোমল হলেও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুদৃঢ় এবং কর্ম্মঠ। এরই মধ্যে সে মাঠে যায় গরু চরাতে; সেখানে গিয়ে বাঁশী বাজায় আর এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যেবেলায় এসে মায়ের মুখে তার ছোটোবেলাকার কথা, তার বাবার কথা, সব মন দিয়ে শোনে; শুনতে শুনতে বলে ওঠে—'আচ্ছা মা, বাপুকে কি রকম দেখ্‌তে" ?

"ঠিক তোর মত।"

"সে কি আর আসবে না ? আমি তাকে কবে দেখ্‌বো ?"

ময়না চোখ মুছে বলে, "নিশ্চয় আসবে, তোকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না।"

মায়ের চোখ মোছা দেখে মঙ্‌লু জিজ্ঞাসা করে, "তুই কাঁদিস কেন মা ?"

'দূর পাগল, কাঁদলুম কোথা, আমার চোখে মাঝে মাঝে আপনা হ'তেই জল পড়ে।"

"বাপুকে দেখ্‌তে পাস্‌না বলে, না ? আচ্ছা মা, বাপু আমাকে খুব ভালবাস্‌তো ? আদর করতো ?"

ময়না মঙ্‌লুকে বুকে জড়িয়ে চুমা খেয়ে তার প্রশ্নের উত্তর দিতো, "তোকে না দেখে এক পলকও সে থাকতে পারতো না। ক্ষেতে কাজ ক'রতে ক'রতে দশবার ছুটে এসে দেখ্‌তো, তুই কি করছিস, কোথায় আছিস্, কখনও বা তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতো।

জংলীফুল পেড়ে দিতো, তুই গাছের ছায়ায় বসে খেলা করতিস্ আর সে গান গাইতে গাইতে কাজ করে যেতো।"

মায়ের মুখের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে মঙ্‌লু প্রশ্ন ক'রলো—"তবে বাপু আসেনা কেন ?"

"আসবে, কাজ শেষ হ'লেই তোকে দেখ্‌তে আসবে।"

এইসব শুনতে শুনতে মঙ্‌লু মায়ের কোলের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তো আর ময়না তার ঘুমন্ত সুন্দর কচি মুখখানি দেখে চোখের জল আর রাখতে পারতো না।

আরও বছর তিন একই ভাবে কেটে গেল। দুখিয়া কোথায় এবং কি ভাবে আছে কেউ বল্‌তে পারে না। ময়না দুঃখে একেবারে ভেঙে পড়েছে—তার আর বাঁচতে ইচ্ছে হয়না, কেবল একমাত্র ঐ কচি ছেলেটাই তার সান্ত্বনা। ওর জন্যেই তাকে দুঃখে কষ্টে কোনো রকমে বেঁচে থাকতে হবে—নইলে ওর উপায় কি হবে ? একমাত্র মঙ্‌লুই এখন তার সমস্ত হৃদয় অধিকার করেছে। তার সমস্ত স্নেহ মমতা ভালোবাসা ঐ ছোট্ট ছেলেটিকে ঘিরেই রয়েছে—তার জীবনের একমাত্র সম্বল সে। সুতরাং মাঝে মাঝে ময়নার মরতে ইচ্ছে হলেও ওকে নিঃসহায় করে পথে ফেলে রেখে ত সে মরতে পারে না। এখন তার একমাত্র কামনা, তার মঙ্‌লুকে মানুষ করে সুখী করে তার হাসিমুখ দেখে সে যেন ঘুমাতে পারে চিরদিনের জন্যে।

মঙ্লুকে নিয়ে তার দিনগুলো বিচ্ছেদ বেদনার মধ্যেও এমনি ধারা আনন্দে কেটে যেতে থাকে—মঙ্লুর ভবিষ্যৎ সুখের কথা ভেবে। একদিন সকালে ময়না উঠে তার ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘর পরিষ্কার ক'রছে, মঙ্লু গরু নিয়ে বেরিয়ে গেছে—এমন সময় একটি লোক এসে ময়নাকে ব'ললে—তার কপাল ফিরেছে, তার সুখের দিন আবার ফিরে আসছে, তাকে আর দুঃখ করতে হবে না। দুখিয়া চিঠি লিখেছে পাশের গ্রামে তার এক বন্ধুর কাছে। লিখেছে—সে কলের কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে আসছে, কাল সকালে সে তাদের গ্রামে এসে পৌঁছবে, কেউ যেন ময়নাকে গিয়ে এ খবর দিয়ে আসে।

একথা শুনে ময়না আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠলো। সে যে কি করবে প্রথমে কিছুই ঠিক ক'রতে পারল না—পুলকে অবশ হয়ে গেল তার সর্ব্বশরীর, আনন্দ তার কণ্ঠরোধ করে দিল। কিছুক্ষণ অভিভূতের মত থাকবার পর সে ছুটে বেরিয়ে এল—মাঠের পথ বেয়ে ছুটে চল্‌লো, যেখানে মঙ্লু গরু চরাচ্ছে। ময়না আজ যেন নূতন করে বেঁচে উঠেছে—আবার আজ যেন তার নূতন করে জীবন শুরু হ'লো; তার শরীর আজ নূতন ক'রে সতেজ হ'য়ে উঠলো, যৌবনের আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মন আবার দৃঢ় হ'য়ে উঠলো। আজ তার মুখে কী লাবণ্য, কত হাসি! এতদিনের বিরহ বেদনায় চাপা আনন্দ যেন এক মুহূর্ত্তে বাঁধ ভেঙে তার সর্ব্বশরীরে ও মনে একটা সাড়া এনে দিলো। সে

ছুটে গিয়ে মঙ্‌লুকে বুকে জড়িয়ে ব'ল্‌লে—"ওরে মঙ্‌লু, তোর বাপু কাল আসছে ফিরে—কাল সকালে!" এর চেয়ে সুখের সংবাদ আর কি হতে পারে! তার দুখিয়া আবার ফিরে আসছে—আবার তাদের ছোট্ট সংসারের মধ্যে হাসির তরঙ্গ বয়ে যাবে—কি আনন্দ আজ তার সেই কথা ভেবে!

মা ও ছেলে আজ বড় ব্যস্ত, একমুহূর্ত্তও তাদের অবসর নেই। কাল সকালেই দুখিয়া আসবে, কতদিন পরে আসছে, ঘরদোর সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে। দুখিয়ার জন্য ময়না চাপাটি তৈরী ক'রলো—কাল সকালে এলেই চাপাটি আর মেঠাই খেতে দেবে। বিছানা মাদুর সব পরিষ্কার ক'রলে উঠান নিকালো, ঘর ঝাঁট দিলো—আজ তার নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। মঙ্‌লুও গোয়াল পরিষ্কার ক'রলো, গরুবাছুরকে ধুইয়ে আন্‌লো। কুটিরের সামনে ছোট্ট বাগানের আগাছা সব তুলে ফেললো—আর মনে মনে ভাবলো—বাপু এসে বল্‌বে, "মঙ্‌লু আমার কত লক্ষ্মী ছেলে!" সারাদিন হাতের কাজের সঙ্গে সঙ্গে তার মনেরও বিশ্রাম নেই—কেবল ভাবছে—বাপু এলে কি বল্‌বে তাকে। সে খুব বকে দেবে—কেন এতদিন আসে নি, কোন খবর দেয়নি, মাকে কেন এত কষ্ট দিয়েছে। বাপু হয়ত তখন তাকে কোলে নিয়ে বল্‌বে, "মঙ্‌লু, আর কখনো তোদের ছেড়ে যাব না—কলের নিয়ম বড় বিশ্রী, চিঠিপত্তর লিখতেও দেয় না—তাইত আমি সব ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম।" বাপু আর

সে মাঠে কাজ ক'রবে একসঙ্গে সারাদিন—কত গল্প করবে, কত হাসবে! সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফিরে এসে দাওয়ায় বসে দু'জনে খাবে, আর মা পরিবেষণ করবে। মা কত সুন্দর সুন্দর খাবার তৈরী ক'রবে তাদের জন্যে! আরও কত কি আনন্দের ছবি একে একে তার মনে ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

দিন যত শেষ হ'তে লাগ্‌লো, সন্ধ্যে যত এগিয়ে আসতে লাগ্‌লো, মা ও ছেলের আনন্দ তত বাড়তে লাগলো—আর এই রাতটা, তারপরেই ত দুখিয়া এসে পড়বে সকালে।

পাহাড়টাও এতদিন ওদের দুঃখে কাতর হ'য়ে ছিলো; আজ তারও মুখে হাসি ধরে না ওদের খুসী দেখে। সন্ধ্যের সময় সূর্য্যদেব তাঁর নানারঙে পাহাড়ের হাসিকে আরও মধুর, আরও সুন্দর ক'রে তার পিছনে লুকিয়ে পড়লেন। তাঁর শেষ রশ্মির ছটায় সে জায়গাটা স্বপ্নপুরীর মত নয়ন-লোভন হয়ে উঠ্‌লো। রূপরাজ্যের সিংহদ্বার ভেঙ্গে সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন আজ ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর বুকের উপর! কিন্তু ওকি? ঐ যে আকাশের এককোণে যমদূতের মত দাঁড়িয়ে ওটা কি? কালো মেঘ কালান্তক যমের মত বিষ দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন। চোখে ক্রূর অভিসন্ধি। ময়নার বুক কেঁপে উঠ্‌লো। সেই কালো মেঘ ধীরে ধীরে আকাশের হাসিকে ঘন অন্ধকারে ঢেকে দিলো; রূপকথার রাজ্যের সৌন্দর্য্য কোথায় মিলিয়ে গিয়ে রইলো

কেবল বিকট মেঘ আর আঁধার সাপের ফোঁসফোঁসানি। মঙ্লু ভয়ে মায়ের কোলে মুখ লুকালো।

কখন রাত্রে যে আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে ঝড় উঠেছে, তারা তার কিছুই টের পায়নি—মেঘের গর্জ্জনে কাণ বধির হয়ে গেল, বিদ্যুৎচমকে চোখ ধাঁধিয়ে উঠ্‌লো—বাতাসের সে কি ভীষণ চীৎকার—সব বুঝি এইবার ধ্বংস হয়ে যায়!

মঙ্লু ভয় পেয়ে, মাকে জড়িয়ে ধরলো—আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা ক'রলো—"মা, বাপু এই ঝড়ে কি করে আসবে?" তার কথার উত্তর দেবার পূর্ব্বেই ঝড়ের ঝাপ্‌টায় তাদের ঝাঁপ পড়ে গেল, বিদ্যুতের চমক তাদের ঘরে ঢুকে অট্টহাসি হেসে গেল! মঙ্লু মাকে সজোরে আঁকড়ে ধরলো—তার বুক দুর দুর করছে তখন।

ময়নারও বুক কাঁপছে—বাইরে ঝড়ের তাণ্ডবলীলার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের ঝড়ও বাড়তে লাগলো। এত ঝড় আজকের দিনের জন্যেই কি অপেক্ষা করে ছিলো—কেন কালও ত হতে পারতো? ঠাকুর, কমিয়ে দাও এই ঝড়—দুখিয়া যে অনেকদিন পরে আসছে, সে যে বড় আশা করে আছে—আবার সুখের নীড় বাঁধবে বলে। তুমি এত নিষ্ঠুর কেন, এত দুঃখ দিয়েও কি তোমার আশ মিট্‌লো না? থামিয়ে দাও ঝড়, এত নির্দ্দয় হ'য়োনা। আবার বিদ্যুতের অট্টহাসি—আলোর ঝল্‌কে আর

বজ্রের গর্জ্জনে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে কাণে তালা লাগিয়ে দিলো, কে শোনে তার প্রার্থনা !

এ কি ? এ ত শুধু ঝড়বৃষ্টি নয়, এ যে ভূমিকম্প ! ময়না মঙ্লুকে কোলে নিয়ে উঠে পড়লো—বাইরে বেরোবার চেষ্টা ক'রলো, কিন্তু যাবে কোথায় ? ঝড়ের ঝাপ্টায় তাকে আবার ঘরের ভিতর ফেলে দিলো। ময়না মূর্চ্ছিতা হয়ে লুটিয়ে প'ড়লো মেঝেতে। মঙ্লু একবার "মা" বলেই চুপ ক'রলো।

প্রবল কম্পনে ঘরের দেওয়াল চারিদিকে ভেঙে প'ড়লো। প্রকৃতি আজ ধ্বংসের আনন্দে তাণ্ডব নৃত্য সুরু ক'রেছে।

সকাল হ'লো—প্রকৃতি তখন নিস্তব্ধ, সারারাত ধ্বংসের আনন্দে নৃত্য ক'রে পরিশ্রান্ত হয়ে এখন নিঝ্ঝুম হয়ে পড়েছে। নিজেই নিজের সৌন্দর্য্যকে বিকৃত করে মলিন বদনে যেন অনুতাপ ক'রছে।

পাহাড়টা যখন চোখ খুল্লো—দেখে কোথায় তার সঙ্গীদের ঘরবাড়ী, আর কোথায় বা তার খেলার সাথী মঙ্লু! তাদের ঘর যেখানে ছিল, সেখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা ছোট্ট নদী—বালি আর ঘোলা জলের স্রোত নিয়ে। তার চোখ দুটো বিস্ফারিত হ'য়ে নদীটার দিকে চেয়ে রইলো, পলক প'ড়লো না আর কখনও। এই সেই নদী, যে ময়নার সুখের ঘর ধুয়ে নিয়ে গেছে চিরদিনের জন্যে, তাই পাহাড়টার তীব্র দৃষ্টি সদাই নিবদ্ধ রয়েছে ওর উপর।

স্মৃতির বোঝা

পথিক, শ্রান্ত হয়েছ ? এসো, আমার ছায়ায় ব'সে তোমার ক্লান্তি দূর করো। ভাব্‌ছ কেন ? এ কাজ ত আমার নূতন নয়—যুগ যুগ ধরে এইখানে এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছি ! কত পরিবর্ত্তন হ'ল, কত লোক এল, কত গেল ! গ্রীষ্ম এসে ঝল্‌সে দেয়, সমবেদনাতুর বর্ষা এসে শীতল স্পর্শে জ্বালা জুড়িয়ে দেয়, শরতের সোণালী রোদে হাসি ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই হেমন্ত এসে শীতের দাবী স্মরণ করিয়ে ম্লান করে, তারপরই শীত এসে দেয় রিক্ত করে ; আমার কঙ্কালগুলোর কান্নার পালা শুরু হয় ; বোধ হয় সে-কান্না শুনে থাক্‌তে না পেরে বসন্ত এসে তার সোণার কাঠি ছুঁইয়ে আবার রূপযৌবন ফিরিয়ে দেয়। তখন আবার নূতন জীবনের প্রবাহে পুলকিত হয়ে উঠি, আবার দেহ-মনের শ্রী ফিরে আসে, তখন আবার মলয় সমীরের কাণে কাণে কথা কইতে ইচ্ছে করে, পিকের পঞ্চমস্বরে প্রতিধ্বনি করবার ইচ্ছে জাগে। এইভাবে হারানো আর পাওয়ার ভিতর দিয়ে কেটে যায় কত বছর, কিন্তু তার মাঝে মাঝে বেদনাকরুণ একটা স্মৃতির মর্ম্মান্তিক ব্যথায় অন্তর ছারখার করে দেয় ! যখন একেবারে অসহ্য হয়ে ওঠে—তখন কাউকে না বলে কোনমতেই নিজেকে হালকা করতে পারি না। সে কথা

আজ পর্য্যন্ত অনেককে শুনিয়েছি, তোমাকেও আজ শুনতে হবে, তা না হলে নীরব অশ্রুনির্ঝরেও আমার অন্তর শান্ত হবেনা যে! পথিক; চলে যেওনা, শোনো—আমার ব্যথার কথা শোনো—

অনেকদিন আগেকার কথা, তারা দু'জনে আস্‌তো আমার কাছে। আমাকে তাদের বড়ো ভালো লাগতো। তাদের কচি পায়ের পরশে আমার ছায়া সজীব হয়ে উঠতো, সহস্র চক্ষে তাদের আনন্দ-সুধা পান করতাম। সারাদিন বালি নিয়ে কত ভাঙা-গড়ার কাজ চলতো, কচি হাতে কত শিল্প গড়ে উঠে পর-মুহূর্ত্তে আবার ধ্বংস হয়ে যেতো। মেয়েটীর নাম ছিল নীলা; হ্যাঁ, নীলার মতই ছিল তার চোখ দুটী—উজ্জ্বল, শান্ত আর সমুদ্রের মত অতল—তাকিয়ে থাকলেও কোনো কূলকিনারা মিলতো না! নীলার খেলার সাথী ছিল জয়ন্ত—সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটী, বড় চঞ্চল।

আমার প্রতিবেশেই তাদের ভাঙাগড়া, স্থিতি-প্রলয়ের খেলা শুরু হলো। পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বাধলে আমাকে মধ্যস্থ মানতো—মিটমাট করে দিতে হতো। আবার ভাব হলে আমাকেও তাদের খেলার সাথী করে নিতো। কিন্তু আমার ছুটে বেড়াবার ক্ষমতা নেই তাই 'বুড়ি' হয়ে বসে থাকতাম! এইভাবে অনাবিল আনন্দের মধ্যে তাদের কৈশোর গেল কেটে।

বসন্ত এল—শ্যাম বনানী আজ হোলীর রঙে রঙ মিশিয়ে লাল হয়ে উঠেছে, গাছগুলো ফুলের ঝারি নিয়ে চারিদিকে রঙ ছড়াচ্ছে—চারিদিকে সাজবার সাড়া পড়ে গিয়েছে, সকলেই যেন কার আগমনের আশায় যে যার সঞ্চয় নিয়ে প্রতীক্ষা করে আছে ! অনেকদিন পরে জয়ন্ত ও নীলা এলো আমার কাছে—কিন্তু একি ? প্রকৃতিদেবীর সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাঝেও পরিবর্ত্তন ! সে চঞ্চলতা সে চপলতা গেল কোথায়—তার স্থান দখল করেছে সংযম, সরম ! নীলার চোখ দুটিতে যেন আজ নূতন রূপ ধরেছে—বড় করুণ ওর চাহনি—কে যেন হারিয়ে গেছে, তাকে একান্তভাবে খুঁজে পেতে চায়।

ঐ যে, যেখানে নদীটা বয়ে যাচ্ছে, ঐখানে ওরা দুজনে গিয়ে বসলো। কই আজতো তারা সে রকম সহজ সরলভাবে কথা বলতে পারছে না ! কোথায় যেন বাধা রয়েছে—নীলা যতবার কথা বলতে চায়, কে যেন এসে ওর কণ্ঠরোধ করে ; শেষে জোর করেই যেন বলে উঠলো—“জয়ন্ত, এ হতে পারেনা ? তোমাকে ছাড়া কোনদিন তো আর কাউকে ভাবতে পারিনি—চিরকাল তুমিই আমার সাথী হয়ে থাকবে এই তো জানতাম” ? জয়ন্ত কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে বলে, “নীলা, সমাজ যে বড় কঠিন, ও যা বলবে, যা আদেশ দেবে তাই যে আমাদের মাথা পেতে নিতে হবে।

আমাদের স্থখ সে চায়না, চায় কেবল আমাদের সশঙ্ক আনুগত্য।"

নীলা চুপ করে থাকে। হঠাৎ আবার আগের মত চঞ্চল হয়ে ওঠে—ছুটে গিয়ে দুটো ফুল ছিঁড়ে নিয়ে এলো। জয়ন্তকে জলের খুব কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বললে "ছোটবেলায় আমরা যে রকম ফুল ভাসিয়ে দিতাম, এসো আজকেও সেই খেলা খেলি।" জয়ন্ত ও নীলার ফুল ভেসে চল্‌লো—কখনও পাশা-পাশি সমান তালে চলতে লাগলো, কখনও বা ছোট্ট ঢেউ এসে তাদের আলাদা করে দেয়। আবার মেলায়। কখনও বা বড় ঢেউ এসে তাদের ব্যবধানের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, এইভাবে ভাসতে ভাসতে ফুল দুটী চলল—দু'জনে সেইদিকে তাকিয়ে থাকে, যতদূর দেখা যায়। নীলা বলে ওঠে, "কই ওরা তো মিললো না ?"

জয়ন্ত তার হাত ধরে বলে, "এপারে ওদের মিলন হ'লো না কিন্তু ওপারে গিয়ে দুটাতে ঠিক একই জায়গায় পৌঁছেচে, নদীর তীরে বালির প'রে দুটীতে পাশাপাশি পড়ে আছে—কেউ বাধা দেবার নেই।"

নীলা কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাব্‌তে থাকে, তারপর বলে ওঠে—"বাড়ী যাই, বেলা হলো।" তারা দু'জনেই চলে গেল।

পথিক, শুনছ—কিছুদিন পরে দেখলাম ঐ সামনের পথ দিয়ে বরযাত্রীদল চলেছে হৈ হৈ করতে করতে বাজনা বাজিয়ে।

পাল্কীর ভিতরে বৌ ; দরজাটা একটু খোলা, চমকে উঠলাম। দেখি ভিতরে বসে রয়েছে নীলা—শীতের গোধূলির মত ম্লান, রিক্তশ্রী পুষ্পের মত আনত! তার হাস্যউচ্ছল আঁখি আজ অশ্রুভারানত! আমার সহস্র চক্ষুও সজল হয়ে উঠলো—তারা চলে গেল, দুঃখের বোঝা নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম এখানে—ভগবান অচল করেছেন যে! জয়ন্ত আর আসেনি, তার খবর কিছুই জানতে পারিনি। মাঝে মাঝে তাদের কথা মনে পড়তো, ভাবতাম এবার এলে আর ছাড়বো না, আমার অন্তর দিয়ে বেঁধে রাখবো তাদের। আবার আসবে এই আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করতে থাকি।

প্রায় বছর খানেক পরের কথা—ঐ—ঐখানে, যেখানে তুমি শুয়ে আছ, ঠিক ওর পাশ দিয়েই তারা জয়ন্তকে নিয়ে চলে গেল—ঐ নদীর চরের দিকে! একটা দমকা বাতাস এসে আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুললো—হু হু করে চোখের জল ঝরে পড়লো, তাদের বললাম—"ওকি? তোমরা আমার বন্ধুকে কোথায় নিয়ে যাও? ও যে আমাকে বড় ভালবাসতো, এই পথে এলে ও যে কোনোদিন আমার কাছে না এসে থাকতে পারত না! ওগো, তোমরা ওকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেওনা!" তারা শুনলো না, চলে গেল। তাদের পিছু পিছু ছুটতে ইচ্ছে হলো, পারলাম না—চীৎকার করে বললাম "তোমরা

অত নিষ্ঠুর হয়ো না, ওকে আমার কাছে দিয়ে যাও। কেউ ফিরে চাইলে না, পথিক, তারা জয়ন্তকে নিয়ে চলে গেল !

দু'দিন পরের কথা—সে এক দুর্য্যোগের দিন ; কালো মেঘে সারা আকাশ পরিব্যাপ্ত, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের ঝলক তার ভীষণতাকে আরও ভয়ার্ত্ত ও গম্ভীর করে তুলছে—চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম, কেমন যেন একটা থমথমে ভাব, সবাই যেন একটা প্রলয়ঙ্কর ঘটনার প্রতীক্ষা করছে। কেবল নদীর জল মাঝে মাঝে গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদে উঠছে !

আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম ! এই দুর্য্যোগ মাথায় করে দেখি কে একটি মেয়ে এদিকে ছুটে আসছে পাগলিনীর মত ! কাছে আসতেই দেখলাম ও আর কেউ নয়, আমার চিরপরিচিতা নীলা ! আমার কাছে এসেই তার শীর্ণ বাহু দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে—'তুমি জয়ন্তকে আটকে রাখতে পারলে না ? কেন বললে না আমি আসবো, আবার এইখানে পাতার ঘর তুলবো, আগের মত খেলা করবো আর কখনও তাকে ছেড়ে যাবো না। কেন তুমি একথা বললে না ? ও যে বড় অভিমান করে চলে গেল ? আমি যাবো—তাকে আমি খুঁজে আনবোই।" সে শ্মশানের পথে ছুটে চললো।

চলতে আর পারে না—কোনো রকমে নিজেকে টানতে টানতে নিয়ে পৌঁছলো সেখানে। জয়ন্তর নাম ধরে কতবার

ডাকলো, কত কান্না কাঁদলো, কিন্তু দুঃখিনীর ডাকে কেউ তো সাড়া দিলো না—আস্তে আস্তে এগিয়ে এল নদীর ধারে।

তখন ঝড় উঠেছে, চারিদিকে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চলেছে। পাগলিনী নীলা ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীর জলে—বলে উঠলো—'জয়ন্ত তোমার ফুল হারিয়ে গিয়েছে, আমি তাকে খুঁজে বার করবোই—তুমি তো বলেছিলে ওপারে গিয়ে দুটো ফুলই মিলবে, আমি তোমার······।”

প্রকাণ্ড একটা ঢেউ এসে নীলাকে লুকিয়ে ফেললো, বাকী কথাগুলো ঢেউয়ের সঙ্গে মিশিয়ে গেল জলের বুকে। পথিক, তুমি শুনতে পাচ্ছনা বোধ হয়, কিন্তু আমি এখনও স্পষ্ট শুনছি তার কথা, প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে।

পথিকের তন্দ্রাঘোর কেটে যায়, সে আবার বাস্তব জগতে ফিরে আসে—বেদনাতুর মন নিয়ে সে আবার চলতে শুরু করে দেয় তার চলার পথে। ঝোড়ো হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ওঠে!

বাঁশীর টানে

তখন চারিদিক দুপুরের তন্দ্রায় ঝিমুচ্ছিল; মাঠ, পথ জনশূন্য। দোতলার ঘর থেকে চোখে পড়ে দূরে বৈজয়ন্তী নদীর বাঁকের মুখে জলের ছোট ঢেউগুলো সূর্য্যকিরণে চিক্ চিক্ করে বয়ে যায়; তরুণকুমার আজ তন্দ্রাচ্ছন্ন পুরীর চোখে ধূলো দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সেই নদীর উদ্দেশ্যে। অতি সন্তর্পনে গ্রাম পার হয়ে সে এসে পড়লো মাঠের পথে। আনন্দ আর আশঙ্কায় মিলে বুকের ভিতরটা তখনও দুর দুর করছিল—বার বার পিছনে ফিরে দেখছে কেউ তাকে ধরে নিয়ে যেতে আসছে কিনা। চল্‌তে চল্‌তে যখন দেখলে রূপনগর অনেক দূরে রয়ে গেছে তার পিছনে, এখন কেউ এসে তাকে চট্ করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না, তখন তার বুকের দুর দুরুনি শান্ত হলো, খুসী মনে সে চলতে লাগলো নদীর দিকে; শিকল কাটা দাঁড়ের পাখীর মত তার উল্লাস—এতদিন সে কেবল তার দোতলার ঘরের পালঙ্কের উপর বসে বসে নদীর তীরের কত কাল্পনিক ছবি মনে মনে এঁকেছে, আজ চলেছে সেই সব মিলিয়ে নিতে।

দূরে রূপনগরের বাড়ীগুলো তখন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। তরুণকুমার চলেছিল একমনে, কখন যে প্রাণ মাতানো বাঁশীর

একটা মেঠো সুর তার কানে এসে পৌঁছেছিল সে টেরও পায়নি ; আশ্চর্য্য হয়ে গেল সে সেই সুরে ! দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভাল করে শুনে অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগলো—কে এখানে বাঁশী বাজায় ! চারিদিক যতদূর দেখা যায় দেখলে জনমানব নেই, দূরে নদীর ধারে গাছের ছায়ায় কেবল গোটাকতক গরু ঘুমুচ্ছে, দু'একটা বক তাদের আশে পাশে চরছে অতি সাবধানে, যেন তাদের ঘুমের ব্যাঘাত না হয়।

ভাল করে শুনে সে চললো সেই যে-দিক থেকে ভেসে আসছিল বাঁশীর সুর। সুরের রেশ ধরে এসে পড়লো সেই নদীর ধারে, যে নদী তাকে এতদিন তার ঝিকিমিকি ঢেউ নিয়ে ডাকছিল। কিন্তু এখন তরুণকুমার ঢেউয়ের কথা, নদীর কথা ভুলে, চলেছে সেই বাঁশীর সন্ধানে। সুরের পথে চল্‌তে চল্‌তে নদীর ধারে এক জায়গায় এসে সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে দেখলে, কিছু দূরে গাছের ছায়ায় কালো পাথরের উপর বসে তারই সমবয়সী একটি ছেলে ছোট্ট একটি বাঁশী বাজাচ্ছে আপন মনে—কাকে যেন শোনাচ্ছে তার সুরের কারিকুরি ! সুন্দর কালো তার দেহ, কোঁকড়ানো তার চুল, টানা টানা চোখ দুটি দূরে নদীর ওপারে কি যেন দেখছে। তরুণকুমার আর এক পাও এগোল না, পাছে তাকে দেখতে পেলে ওর বাঁশী থেমে যায়। অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগল—একি সে ? যার কত গল্প সে তার মার মুখে শুনেছে ! এই কি সে ? পুলকে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লো তরুণকুমার।

তন্ময় হ'য়ে কতক্ষণ যে তার বাঁশী শুনেছিল জানে না, কখন যে বাঁশী থেমে গিছলো তাও তরুণকুমারের খেয়াল ছিল না। সেই ছেলেটি যখন তরুণকুমারের দিকে হঠাৎ ফিরে চাইলে তখন তার ঘোর কাট্‌লো। ছেলেটির কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলে—"তুমি কে ভাই ? এমন সুন্দর তুমি বাঁশী বাজাও! তোমায় কে এমন বাঁশী বাজাতে শেখালে ভাই ?"

ছেলেটি তরুণকুমারের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে গিছ্‌লো—নিটোল সুঠাম তার গড়ন, শুভ্র স্নিগ্ধ তার বরণ, বড় বড় দু'টি চোখ, টানা টানা কালো ভুরুর নীচে জ্বল জ্বল করছে, মুখে তার মধুর হাসি। এই ফুটফুটে ছেলেটিকে সে রাজপুত্র ভেবে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলো; তরুণকুমারের প্রশ্ন তার কাণেই পৌঁছয়নি।

তরুণকুমার তার দিকে আরও এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসে তার হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি কে ভাই ? তোমার নাম কি ভাই ?"

বালক অতি ধীরে উত্তর দিলে—"আমার নাম রাখাল।"

তরুণকুমার আরও কাছ ঘেঁসে হেসে বল্‌লে—"রাখাল তোমার নাম ? আমি ভাবছিলুম বুঝি কেষ্ট!"

রাখাল ঘাড় নেড়ে জানালো—না, সে রাখাল।

তরুণকুমার বল্‌লে—"আমার নাম তরুণকুমার। আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু। আমিও তোমায় বন্ধু বলবো আর তুমিও আমায় বন্ধু বলে ডাকবে। বন্ধু—।"

রাখালের তখনও আড়ষ্টভাব সম্পূর্ণ যায়নি, সে কোনো কথা না বলে তরুণকুমারের মুখের দিকে চাইলো।

তরুণকুমার বললে—"বন্ধু, তুমি কথা কইছ না কেন? ভয় করছে?"

রাখাল কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না—এই সুন্দর ছেলেটি কি করে তার বন্ধু হবে! আগেকার মতই আড়ষ্ট ভাবে জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি কে ভাই?"

তরুণকুমার তাকে জড়িয়ে ধরে বললে—"আমি তোমার বন্ধু, তুমি আমায় বন্ধু বলে ডাকবে। বল—বন্ধু।"

রাখাল মন্ত্রমুগ্ধের মতই উত্তর করলে—"বন্ধু।"

তরুণকুমার খুসী ভরে ব'ল্‌লে—"তুমি কি সুন্দর বাঁশী বাজাও! আমি রোজ তোমার বাঁশী শুনতে আসবো। বড় ভালো লাগলো তোমার বাঁশী! আমারও শিখতে ইচ্ছে করছে। তুমি আমায় শিখিয়ে দেবে, বন্ধু?"

রাখাল ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলে—হ্যাঁ, সে তার বন্ধুকে রোজ বাঁশী শোনাবে।

তারপর দুইবন্ধুতে সেই কালো পাথরের উপর বসে তন্ময় হ'য়ে আলাপ করতে লাগল পরস্পরের সঙ্গে—একজন তার মন-ভোলানো বাঁশীতে সুরের পর সুরের স্রোত বইয়ে আর একজন তার নির্ব্বাক নিস্পন্দ বিস্ময়ে মুগ্ধ মনের অসীম আনন্দ প্রকাশ করে। পরস্পর পরস্পরের বন্ধুত্বের গৌরবে আত্মহারা

হয়ে গিছলো। তাদের এই মূক ও মুখর চিত্ত বিনিময়ে পাছে ব্যাঘাত হয় তাই নদীও ছিল শান্ত শব্দহীন, গাছগুলো ছিল স্তব্ধ স্থির, বাতাস ছিল ধীর মন্থর! চৈত্রের খর অপরাহ্ণও যেন এই নবীন সুকুমার কিশোর যুগলের বন্ধুত্বের সংস্পর্শে স্নিগ্ধ শীতল হয়ে উঠলো!

সূর্য্যদেব কখন যে চুপি চুপি নদীর পশ্চিম পারে দূরে তাল গাছের আড়ালে গিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন কেউ জানতে পারেনি। তরুণকুমারের মুখে রোদ পড়তে তার ধ্যান ভাঙলো—বেলা গড়িয়ে এসেছে, তার মা বাবা না জানি এতক্ষণ কি করছেন তাকে খুঁজে না পেয়ে? চঞ্চল হয়ে পড়লো তরুণ কুমার। রাখালের বাঁশী শেষ হতেই তাকে জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি বাড়ী যাবেনা বন্ধু; তোমার মা বাবা খুঁজছেন না?"

রাখাল হেসে বল্‌লে—"মা বাবা খুঁজবেন কেন বন্ধু, আমি ত সন্ধ্যের আগে কোনোদিনই বাড়ী ফিরি না গরু নিয়ে। গরুগুলো যখন ডাকবে বাড়ী যাবার জন্যে তখন যাবো।" তরুণকুমার বললে—"তোমার ত বেশ মজা বন্ধু, সারাদিন তুমি এম্‌নি করে বাঁশী বাজিয়ে কাটাও কেমন আনন্দে, মা বাবা কিছু বলেন না; আর আমার মা বাবা আমাকে একদিনও বাড়ী থেকে বার হ'তে দেন না। আজ লুকিয়ে অনেক কষ্টে ছুটে চলে এসেছি। আমি রোজ এম্‌নি পালিয়ে আসবো, তোমার কাছে, তুমি আমায় বাঁশী শোনাবে, কি বল বন্ধু?"

রাখাল তার কাঁধে হাত রেখে বললে—"বন্ধু, আমি তোমাকে রোজ বাঁশী শোনাব, আমি এই পাথরের উপর বসেই রোজ বাঁশী বাজাই।"

তরুণকুমার জিজ্ঞাসা করলে—"তোমার মত বাজাতে শিখিয়ে দেবে ত বন্ধু ?"

রাখাল বল্‌লে—"আমার বাবাকে বলে হাটের দিনে তোমার জন্যে এইরকম একটা বাঁশী আনাবো, তুমিও বাজাতে পারবে বন্ধু আমার মত। তখন কেমন আমরা দুজনে এইখানে বসে এক-সঙ্গে বাঁশী বাজাবো।"

এদিকে জমিদার বাড়ীতে মহা গণ্ডগোল। ছোট্ট রূপনগর-ময় হৈ চৈ পড়ে গেছে। জমিদার রামলোচনবাবুর একমাত্র পুত্র এবং উত্তরাধিকারী বালক তরুণকুমারকে পাওয়া যাচ্ছে না! গ্রামখানা তন্ন তন্ন করে খোঁজবার পরও যখন কোনো সন্ধান মিললো না, জমিদার পত্নী কাত্যায়ণী দেবী সন্তানের প্রাণের আশঙ্কায় ভূলুণ্ঠিতা হলেন। রামলোচনবাবু বিক্ষিপ্ত চিত্তে সারা বাড়ী ছুটাছুটি করতে লাগলেন। চারিদিকে লোক ছুটলো কুমারের সন্ধানে। গ্রামের পুকুরে পড়লো জাল, মাঠে ছুটলো পাইক। ঠিক সেই সময় তরুণকুমার তাদের গ্রামের সীমায় এসে পৌঁছেচে! চারিদিকে তাদের পাইকদের ব্যস্তভাবে যেতে দেখে তার আর বুঝতে বাকি রইলো না যে, বাড়ীতে বিরাট তোলপাড় শুরু হয়েছে—এরা তারই খোঁজে বেরিয়েছে। ভয়ে

তার মুখ শুকিয়ে গেল। পাইকদের নজরে পড়তেই তারা মহা উল্লাসে ছুটে এসেই কুমারকে একজন কোলে তুলে ফেল্লে। তরুণের বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ কর্তে লাগলো তখন। তারা জিজ্ঞাসা করলে "কোথা গিছলেন খোকাবাবু কাউকে· না বলে?" সে তাদের কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলো। কোলে করে তারা সসম্ভ্রমে নিয়ে এল তরুণকুমারকে রামলোচনবাবুর কাছে, বললে—"খোকাবাবু মাঠের দিক থেকে আসছিলেন ছুটতে ছুটতে"।

রামলোচনবাবু রাগে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথায় গিছলে কাউকে না বলে ?"

তরুণকুমার কোনো উত্তর দিল না ; বাবার মুখের দিকে একবার চেয়ে মুখ নীচু করলো ! রামলোচনবাবু তখন ক্রোধে অধীর হয়ে তাকে প্রহার করতে করতে আবার জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু তরুণকুমার কাঁদেও না, কথার উত্তরও দেয় না। প্রহারের মাত্রা চড়তে লাগলো ; অন্দরে তার খবর পৌঁছতেই কাত্যায়নী দেবী ছুটে এসে তরুণকুমারকে তার ক্রুদ্ধ উত্তেজিত পিতার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন। মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে তরুণকুমার ডুকরে কেঁদে উঠলো।

রামলোচনবাবুর রাগ তখনও কমেনি। অন্দরে এসে স্ত্রীকে বললেন—"ছেড়ে দাও ওকে, আমি আজ দেখে নেব ও কত বড় দুষ্টু। কোথায় গিছল আমি জানতে চাই।"

তরুণকুমার সভয়ে মা'র গলা জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—"বন্ধুর কাছে গিছলুম, বাঁশী........"

আর বলতে পারলে না, রুদ্ধ ক্রন্দনের বেগ এসে তার সমস্ত কথা চাপা দিয়ে দিলে। কাত্যায়ণী দেবী স্বামীকে তাঁর অসংযত ক্রোধের জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন তরুণকুমারকে।

পরের দিন থেকে তরুণকুমারের আর বাড়ীর বার হবার উপায় রইলো না পিতার কড়া শাসনে। বেচারা মুসড়ে পড়লো। সকাল থেকে সে চুপচাপ তার দোতলার ঘরটিতে বসে রইলো একলাটি; গুরুমশাই পড়াতে এসে ফিরে গেলেন; চাকর স্নান করাতে এসে ফিরে গেল—মা এসে কতবার আদর করেও কিছুতেই তাকে বিছানা থেকে তুলতে পারলেন না। সে সেই যে জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল আর কিছুতেই উঠলো না। দুপুর উত্তীর্ণ হয়ে গেলে মা তার ঘরে এসে আদর করে তুলতে গিয়ে চম্‌কে উঠলেন তার গায়ের উত্তাপে। তরুণকুমার জ্বরে অচৈতন্য।

দু'দিন তরুণের জ্ঞান হয়নি। বাড়ীময় একটা নিবিড় আতঙ্ক, সকলেই বিষণ্ণ। নিকটবর্ত্তী প্রবীণ চিকিৎসককে আনতে লোক পাঠানো হলো। দ্বিতীয় দিনে জ্বর বিকারে পরিণত হলো। তরুণকুমার প্রলাপ বকতে লাগলো। মা তার শয্যায় মূর্চ্ছিতা

হয়ে পড়লেন। তরুণ প্রলাপের ঘোরে চীৎকার করতে লাগলো—"বন্ধু আমি তোমার কাছে যাব।"

সাশ্রুনেত্রে রামলোচন পুত্রের মাথায় জল-পটি দিতে দিতে বললেন—"তোমার বন্ধু কোথায় বল বাবা, তাকে আমি তোমার কাছে নিয়ে আসবো এখুনি।" কোন সাড়া পেলেন না।

আবার কিছুক্ষণ পরে তরুণ চীৎকার করে উঠলো—"বন্ধু, বাঁশী—"

তার সব কথাগুলো বোঝা গেল না। রামলোচনবাবু ক্রন্দন জড়িত কণ্ঠে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—"বল বাবা তোমার বন্ধু কোথায় থাকে, আমি এখনি তাকে নিয়ে আসছি।"

আবার সব শান্ত। এমনি করে দিন কেটে গেল উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে। সন্ধ্যের সময় সরকারী চিকিৎসক এসে রোগীকে পরীক্ষা করে আশ্বাস দিলেন—আর কোনো ভয়ের কারণ নেই —সব কথা শুনে বল্লেন—"প্রবল মর্ম্মান্তিক চিন্তায় ওর জ্বরটা উৎকট হয়ে উঠেছিল বলে মনে হয়।"

তাঁর ঔষধ ব্যবস্থায় চতুর্থ দিন সকালে তরুণকুমারের জ্বর গেল। যখন তার জ্ঞান ফিরলো, দেখলে তার মা বাবা তার কাছে বসে আছেন কাতরভাবে। করুণ দৃষ্টিতে মার দিকে চেয়ে বললে—"মা, আমার বন্ধুর কাছে যাব।"

রামলোচনবাবু আদর করে বললেন—"তুমি সেরে উঠলেই যাবে বাবা ; বলো না, তোমার বন্ধু কোথায় থাকে, তাকে এখনি ডেকে পাঠাব।"

তরুণকুমার জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাত নেড়ে জানালে —তার বাড়ী সে জানে না।

তরুণ আজ একটু ভালো, সকলের মুখে আবার হাসি ফুটলো। আজ সে শান্তভাবে ঘুমুচ্ছে দেখে কাত্যায়নী দেবী দুপুরে তার পাশেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন অকাতরে; তিন রাত্রি জাগরণের পর। রামলোচনবাবুও অঘোরে ঘুমচ্ছিলেন পাশের ঘরে, হঠাৎ কাত্যায়নী দেবীর চীৎকারে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হল— তরুণ কোথায় গেল! বাড়ীতে চারিদিক খোঁজার পরে রাম-লোচনবাবু বেরিয়ে পড়লেন বাইরে, লোকজন নিয়ে সেই মাঠের দিকে, প্রথম যে-পথে তাকে পাইকরা সেদিন আসতে দেখেছিল। পাগলের মত প্রাণপণে ছুটতে লাগলেন সেই পথে—দূরে অনেক দূরে একটি ছোট ছেলে ছুটছে ঊর্দ্ধশ্বাসে নদীর দিকে, একটু পরেই—গাছের আড়ালে সে মিলিয়ে গেল। রামলোচন বাবু যন্ত্রচালিতবৎ দৌড়লেন সেই দিক লক্ষ্য করে। লোক-জন ছুটলো সবেগে তাঁকে পিছনে ফেলে। যখন সেই গাছের আড়াল করা নদীর তীরে তারা এসে পৌঁছলো দেখলে একটা কালো পাথরের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে তরুণকুমারের নিস্পন্দ দেহ, তার হাতে একটা নূতন বাঁশের বাঁশী, চোখ থেকে

গড়িয়ে পড়েছে মুক্তোর মত কয়েক ফোঁটা অশ্রু সেই কালো পাথরের বুকে। রামলোচনবাবু দেখেই উন্মত্তের প্রায় চীৎকার করে উঠলেন—"বাবা তরুণ"—

স্তব্ধ প্রান্তর কেবল করুণ প্রতিধ্বনি ক'রলো—তরুণ। আর সকলে রইল স্থির নির্ব্বাক।

ব্যবধান

তেলে জলে মেশে না—এ-সত্য মিতা সেই দিনই উপলব্ধি ক'রেছিল যে-দিন কল্যাণ তাদের দারিদ্র্যের কথা জান্‌তে পেরে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল।

কল্যাণ বোসের পিতা প্রমথেশবাবু, বিলাত ফেরৎ ডাক্তার ; পশার খুব। ল্যান্সডাউন রোডে প্রকাণ্ড বাড়ী হাল ফ্যাসান-দোরস্ত, গাড়ী আছে, বাবুর্চ্চি খানসামাও আছে—চাল চলন সবই বিলাতীয়ানার বুনিয়াদে পাকা। একমাত্র ছেলে কল্যাণ। মিসেস্ বোসের সখ ছিল মেয়ের ; কিন্তু ধনীগৃহে কন্যা বিতরণে বিধাতাব কার্পণ্যের কসুর নাই। সুতরাং মিসেস্ বোস্‌কে কন্যার সখ পুত্রবধূর উপর মেটাবার আশায় থাক্‌তে হ'লো অপেক্ষা ক'রে।

কল্যাণ বাইশ-তেইশ বছরের যুবক, সুন্দর তার গড়ন, বুদ্ধিমান ; এবং রুচিও তার অতিমাত্রায় মার্জ্জিত। এম্-এ প'ড়ছে ; পিতার ইচ্ছা এম্-এ'র পর বিলাত থেকে ব্যারিষ্টার হ'য়ে আসে। কল্যাণের বন্ধু মিতা।

মিতার বাবা দেবব্রত রায়—পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী ; কর্ম্মকুশলতার পুরস্কার স্বরূপ খ্যাতি অর্জ্জন ক'রেছেন যথেষ্ট এবং সরকার বাহাদুর খুসী হ'য়ে দু-দুটি উপাধি ভূষণে ভূষিত

ক'রেছেন তাঁকে। কিন্তু অর্থের বেলা পরম উদাসীন। নাম ও খ্যাতি বহুদূর প্রচারিত হ'লেও তাঁর অর্থের সঙ্গতি কোনোদিনই সংসারের খরচের গণ্ডী ছাড়িয়ে ব্যাঙ্কের সীমানায় পৌঁছতে পারেনি। পরিবারটি খুব ছোট্ট নয়; গৃহিনী, চার ছেলে আর তিন মেয়ে, তা'ছাড়া পরিচারকবর্গ এবং পাচক তো আছেই। ছেলে মেয়েরা সব স্কুল কলেজে প'ড়ছে। মিতা সবার বড়, সে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে আই-এ পড়ে—শান্তশিষ্ট নম্র খুবই। সে সুন্দরীদের দলে গর্ব্বভরে দাঁড়াতে না পারলেও কুৎসিত নয়, তার চেহারায় এমন একটা লাবণ্য আছে, এমন কমনীয় শ্রী আছে যা অনেক রূপসীর মধ্যেও বিরল।

বসু আর রায় পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা খুবই, মাঝে মাঝে যাতায়াতও হ'য়ে থাকে; তবে, কল্যাণকুমারের আবির্ভাবই হয় বেশী মিতাদের বাড়ীতে, কারণ মিতাকে তার খুব ভালো লাগে—প্রায়ই সে মিতার সঙ্গে গল্পগুজব ক'রে সময় কাটিয়ে যায়। মিতা একটু সঙ্কুচিত হয় মাঝে মাঝে, কারণ আর্থিক মর্য্যাদার দিক থেকে কল্যাণদের তুলনায় তারা যে ঢের নীচে। অবিশ্যি মুখে সে-ভাব সে প্রকাশ করে না; তারও কল্যাণকে খুব ভালো লাগে; অত বড়লোকের ছেলে, দেখতেও সুন্দর, পড়াশোনাও করে খুব তবুও কল্যাণ তার খোঁজ করে। কত বড়লোকের বাড়ীতে তার গতিবিধি আছে, কত আধুনিকা সুন্দরীদের সঙ্গে তার পরিচয়; তা সত্ত্বেও কল্যাণ তাকে ঘৃণা করে না, অবজ্ঞা করে

না, সত্যই কল্যাণের স্বভাবটি কি সুন্দর ! মিতা জানে, কল্যাণের মামাতো, মাসতুত বোনেরা তাকে ঠাট্টা করে বলে—"কল্যাণের মতো ছেলে শেষে কিনা মিতার মতো ঐরকম একটা অশিক্ষিত কুৎসিত দরিদ্র মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রলে !" তারা নানা উপায়ে তাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে কিন্তু কল্যাণ ভ্রূক্ষেপ করে না তাদের বিদ্রূপ, তাদের উপহাস।

সেবার দেবব্রতবাবুর ভীষণ অসুখ ক'রলো, ঘুসঘুসে জ্বর আর কিছুতেই ছাড়ে না। অনেক চিকিৎসা ক'রলেন কিন্তু কিছুই ফল হ'লো না ; ছুটিও এল ফুরিয়ে। তাঁরই মুখ চেয়ে এতগুলি প্রাণীকে অপেক্ষা করতে হয় কিন্তু তাঁর রোগ দিন দিন বেড়েই চল্‌লো। বায়ুপরিবর্ত্তনের উপদেশ দিয়ে চিকিৎসকরা নিশ্চিন্ত হ'লেন—কিন্তু তার খরচ বহন করবে কে ? এ সমস্যার কোনই সমাধান ক'রতে পারলেন না।

সেদিন কল্যাণ এসেছে, যেমন আসে মিতার সঙ্গে দেখা করতে। নানা দুশ্চিন্তায় মিতার মন ভেঙ্গে গেছে, শরীরও গেছে মুস্‌ড়ে। কেবল তার মনে হচ্ছে—পয়সার অভাবে আজ তার বাবার হাওয়া বদলের ব্যবস্থা হ'লো না, চিকিৎসা হচ্ছে না। তারা কত দরিদ্র। তবে কি পয়সার অভাবে তার বাবা…… …… নাঃ আর সে ভাবতে পারে না। কল্যাণকে দেখে তার রুদ্ধ বেদনা অশ্রুর বন্যায় বেরিয়ে এল ; কল্যাণ ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"কি হয়েছে মিতা, কাঁদছো কেন ?"

বেদনা জড়িত কণ্ঠে মিতা বল্‌লে—"বাবার বড় অসুখ, ডাক্তারবাবু চেঞ্জে যেতে ব'লেছেন কিন্তু টাকা নেই।"
কল্যাণ যারপর নাই বিস্মিত হ'য়ে মিতার কথাই পুনরুচ্চারণ ক'রলে—"টাকা নেই"! ভাবতে লাগলো—মিতারা এত গরীব! দেবব্রতবাবুর চেঞ্জে যাবার মতও টাকা নেই! কিছুতেই তার বিশ্বাস হ'লো না। মিতাকে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"বলো কি? তা'হলে কি হবে?"

মিতা সজল নেত্রে উত্তর দিলে—"চেঞ্জে যাওয়াও হবে না—বাবার অসুখও বোধ হয় আর সারবে না!"

কল্যাণ ব'ল্‌লে—"টাকা দেবার মতো কি কেউ নেই তোমাদের?"

মিতা ব'ল্‌লে—"না, তাছাড়া বাবাও তা নেবেন না।" ব'লে মিতা দেবব্রতবাবুকে ওষুধ দেবার জন্যে উঠে গেল; কল্যাণও যন্ত্রচালিতবৎ কখন যে সেখান থেকে নিজেদের বাড়ীতে ফিরে এসেছিল—বুঝতেই পারলো না। ঘুরে ফিরে তার মনে কেবল একটা কথাই উদয় হ'তে লাগলো—মিতাদের টাকা নেই! যতই ভাবে ঐ কথাটা, মিতা তার মন থেকে ততই দূরে সরে যায়—অস্পষ্ট হ'য়ে আসে তার ছবি।

দম্‌কা হাওয়া যে কখন কোন্ দিকে চলে তার যেমন কিছুই স্থিরতা নেই—মানুষের মনের গতিও ঠিক ঐ এলোমেলো হাওয়ার মতো দিকভ্রান্ত। এক পথে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে বাধা পেয়ে

ধরে অন্য পথ—সে পথে বাধা পেয়ে আবার অন্য দিকে যায় ঘুরে, কেউ তার গতি বেঁধে রাখতে পারে না।

মাসখানেক হ'য়ে গেছে। কল্যাণ সেই চ'লে এসেছে মিতাদের বাড়ী থেকে, তাদের আর কোনো খোঁজখবর করেনি, করা দরকারও মনে করে নি। তার বোনেদের কথাই সে এখন মেনে নিয়েছে। আজ তার ভাবলেও ঘৃণা হয়—ছি-ছি—মিতার মতো একটা দরিদ্র মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'য়েছিল! এ কথা মনে ক'রলেও লজ্জা হয় তার; ধিক্‌কার আসে। সে তার বন্ধুদের কাছে আর মিতার নামোচ্চারণ করে না; বলে—কল্যাণকুমার ওসব লোকের সঙ্গে কথা ব'লতেও ঘৃণাবোধ করে। এতদিন ওরা নিজেদের স্বরূপ লুকিয়ে রেখেছিল ব'লেই সে আমোল দিয়েছিল ওদের, কিন্তু এখন আর সে দিকেই মাড়ায় না। কত আই-সি-এস ও ব্যারিষ্টারের কায়দাদোরস্ত শিক্ষিতা সুন্দরী কন্যারত্ন তার পথ চেয়ে ব'সে আছে আর সে কিনা মিতার মতো একটা গরীব মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রবে—একথা ভাবাও যে অন্যায়।

রাঁচীতে মিতার এক মাসীমা থাকেন; অন্য কোনো উপায় না দেখে মিতার মা তার বাবাকে নিয়ে বোনের বাড়ীতে আজ মাসখানেক হ'লো উঠেছেন। দেবব্রতবাবু সেখানে গিয়ে ভালই আছেন, ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে চ'লেছেন; ডাক্তার বাবু ব'লেছেন আর মাসখানেকের মধ্যেই তিনি সুস্থ সবল হ'য়ে

উঠবেন এবং কাজে যোগ দিতে পারবেন। মিতারা কয় ভাই-বোন রয়েছে কলিকাতায়—পড়াশুনা ক'রছে ; এখন সংসারের ভার প'ড়েছে মিতার উপর। তাকে সকল দিককার তত্ত্বাবধানও ক'রতে হয় আবার কলেজেও যেতে হয়।

সেদিন কলেজে তার 'লিজার পিরিয়ডে' মিতার বন্ধু সুরমা তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"আচ্ছা মিতা. কল্যাণবাবু আজকাল তোদের বাড়ীতে যান না, না ?"

মিতা বিস্মিত হয়ে বল্‌লে—"না ; তুই সে কথা জিজ্ঞাসা করছিস্ কেন ?

সুরমা ব'ললে—কল্যাণবাবুর এক মামাতো বোনের সঙ্গে তার আলাপ আছে, সেই সুরমাকে বলেছে যে, তোদের ক্লাসের মিতা রায়ের খবর কি রে ? বড় যে লোভ ছিল, এক পয়সা দামের বঁড়শীতে রুই কাতলা গাঁথতে—এখন মজাটা টের পেয়েছে ত ? কল্যাণদা' ওর নাম পর্য্যন্ত আজকাল মুখে আনে না—ঘৃণায় জ্বলে যায়। আর শোন. মিতাকে আর একটা সুখবর দিস্—আস্‌ছে মাসে কল্যাণদা'র সঙ্গে ব্যারিষ্টার পি, কে, ঘোষের মেয়ের বিয়ে—অপূর্ব্ব সুন্দরী, সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ ক'রেছে।

নির্ব্বিকার প্রস্তর মূর্ত্তির মতোই মিতা শুনে গেল ; শেষে অবিচল ভাবে বল্‌লে —"সত্যি, কল্যাণ বড্ড ভুল ক'রেছিল ; যাক্ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি সে সুখী হোক।"

ক্রীং ক্রীং ক'রে ক্লাসের ঘণ্টা বেজে উঠলো ; মিতাও চমকে উঠ্‌লো ঐ আওয়াজে—তার বুকটা যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেল। উদাসভাবে ক্লাসে ঢুক্‌লো—প্রফেসরের লেক্‌চার শোনবার মতো মনের অবস্থা তার ছিল না। বাইরে একটা ঝাউগাছ বাতাসের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে বেশ কথা ব'লে যাচ্ছিল, সেই দিকে চেয়ে চেয়ে সে-ও ভাবতে লাগ্‌লো—সেই ঝাউ গাছ আর বাতাসের কথা, কী চমৎকার তাদের ভালোবাসা! দারিদ্র্যের রুদ্র দৃষ্টিতে তাদের প্রীতির সম্বন্ধ শুষ্ক হয় না। কেমন অটুট গ্রন্থিতে চ'লেছে তারা ঋতুর পর ঋতু, বৎসরের পর বৎসর—কতো নূতন আশা নিয়ে, কতো নূতন কথা নিয়ে ভালোবাসার পথে। আর মানুষের ভালোবাসা—টপ্ টপ্ ক'রে দু'টি পরিপূর্ণ অশ্রুবিন্দু তার চোখ থেকে গ'ড়িয়ে প'ড়লো তার সাম্‌নে খোলা বইয়ের পাতার উপর।

তার পাশ থেকে বেলা তাকে ধীরে ধীরে স্পর্শ ক'রে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা ক'রলে—"মিতা, তুই কাঁদছিস ?"

মিতা প্রকৃতিস্থ হ'য়ে চোখ মুছতে মুছতে ব'ল্‌লে—"মনটা বড়ো খারাপ, বাবার অসুখ।"

বেলা তার পিঠ চাপ্‌ড়ে চাপা গলায় আশ্বাস দিলে—"তোর মতো পাগলী দুটি নেই! অসুখ কি কারো করে না? বাবা সেরে উঠ্‌বেন নিশ্চয়, চুপ্ কর কাঁদিস্ নি।"

মিতা তার কথায় চোখ মুছে পড়ায় মন দেবার চেষ্টা করে কিন্তু সেই বাতাসের সঙ্গে ঝাউ গাছের অশ্রান্ত প্রণয়ালাপ বার বার তাকে অন্যমনা ক'রে কাঁদিয়ে দেয়—কিছুতেই তার চোখের জল থামাতে পারে না মিতা।

মৃত্যু বাসর

রাঙা হাসির চূর্ণ রশ্মি সম্পাতে আলোক-শ্রান্ত প্রকৃতির অবসাদ মুছাইয়া গোধূলী তাহাকে তপনের শ্রান্ত মধুর বিদায় অভিনন্দন জানাইয়া দিয়াছে। আকাশে তখন বিদায়ের বিষাদ-করুণ রাগিণীর উচ্ছ্বাস; বাতাসে বাজিতেছিল সন্ধ্যার স্নিগ্ধ আগমনী।

প্রশান্ত সন্ধ্যার মতই ধীরে ধীরে রাজকুমারী নন্দিতা তাহার চিরপরিচিতা চঞ্চলা সিপ্রার তীরে আসিয়া কালো পাথরের উপর বসিয়াছিল। তখন সিপ্রা সেই আবির মাখা আকাশকে বুকে লইয়া আত্মহারা; প্রথম প্রণয় আবেশে বিভোর প্রেমিকার মত উচ্ছল গতিতে নৃত্য-ছন্দে চলিয়াছে আপনার অভিষ্ট অভিমুখে; তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের শিখরে শিখরে ফুটিয়া উঠিতেছিল সুখ, ছল্-ছল্ প্রবাহে মুখর হইয়াছিল তাহার আনন্দ। মধ্যে মধ্যে তটের বুকে লুটাইয়া মৃদু সোহাগ স্পর্শে তাহার শিরায় শিরায় অব্যক্ত পুলকের মদির উন্মাদনার সঞ্চার করিতেছিল। তীরের বৃক্ষ শাখায় বিহগকুল তাহাকে উৎসাহিত করিতেছিল কলকাকলীতে অভিসার সঙ্গীত গাহিয়া।

কালো জলের উপর প্রস্ফুটিত রক্তপদ্মের ন্যায় নন্দিতা সেই কালো পাথরের উপর বসিয়া উল্লসিত সিপ্রার উল্লাস-নৃত্যে মুগ্ধ হইয়াছিল। সিপ্রা ক্রমশঃ ক্ষীণকায়া হইয়া সুদূর দিক্-চক্রবালে

বিলীন হইয়া যাইতেছে। নন্দিতার দৃষ্টিও সিপ্রার বিলীয়মান গতি অনুসরণ করিতে করিতে কখন যে তাহার জীবনের ফেলিয়া আসা বেদনারঞ্জিত দিনগুলির মধ্যে চলিয়া গিয়াছিল সে জানিতেও পারে নাই।

দৈবের দুর্ণিবার লিখন ললাটে লইয়া মানুষ যেমন অসহায় ভাবে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, সত্তা বর্জ্জিত নিরীহ যন্ত্রের মত আমরণ তাহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া নিতান্ত অসহায়ের মতই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করে। তাহার পঙ্গু পুরুষকারের নিষ্ফল উত্তেজনায় বিধির বিধান লঙ্ঘন করিতে গিয়া তাহাকে কেবলমাত্র নিয়তির তীব্র অট্টহাস কুড়াইতে হয়। নিষ্ঠুর অদৃষ্টের নিকট মানুষের এই চিরন্তন পরাজয় নির্দ্দিষ্ট না হইলে সে রাজার নন্দিনী হইয়াও কেন আজ বনবাসিনী, সর্ব্বহারা, অনাথা!

সে অনেক দিনের কথা; যেদিন তাহার পিতা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজ্য হারাইয়া মৃত্যুর প্রাক্কালে তাঁহার চিরহিতাকাঙ্ক্ষী পুরোহিতের হাতে একমাত্র শিশুকন্যা নন্দিতাকে সমর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন—"গুরুদেব, পরাজয়ের কলঙ্ক লইয়া জীবিত থাকার অভিশাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছি ইহাই আপনার পরম আশীর্ব্বাদ। আমার নন্দিতা মাকে আপনার হস্তে অর্পণ করিলাম; অকৃত অধমের শেষ স্মৃতি এই; গুরুদেব,........"
অব্যক্ত বেদনায় রাজার কণ্ঠস্বর সহসা অবরুদ্ধ হইল; বিগলিত

অশ্রুধারায় তাঁহার ব্যথাতুর অন্তরের শেষ অভিলাষ জানাইয়া দিলেন, কাতর নয়নে তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিলেন। বাষ্পাকুল নেত্রে পুরোহিত তাঁগার মাথায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিলেন—"বৎস, পরাজয়ের গ্লানি তোমায় কোনোদিন স্পর্শ করিতে পারে নাই, আজও তোমার বীরত্ব অম্লান। আশীর্ব্বাদ করি তোমার অক্ষয় স্বর্গ হোক। নন্দিতা মা আমার আজ হইতে আমার জীবনের প্রদীপ স্বরূপ।" এই বলিয়া সস্নেহে তাঁহার কপোলের অশ্রুধার মুছাইয়া বলিলেন—"বৎস, নন্দিতার জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই।" রাজার মুখে ম্লান হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল; সন্তর্পণে পুরোহিতের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে সব শান্ত হইয়া গেল। চিরনিদ্রামগ্ন রাজার নয়নপ্রান্তে মুক্তার মত দুইটি অশ্রুবিন্দু কেবল জাগিয়া রহিল।

সেদিন নন্দিতা কাঁদিয়াছিল কিনা তাহার মনে পড়ে না; আজ তাহার শুভ্র সুন্দর কপোল বহিয়া অবিরাম অশ্রুধার সেই কালো পাথরকে সিক্ত করিতেছিল, কিন্তু নিষ্প্রাণ পাথর ছিল অবিচল।

রাজধানীর বাহিরে বনপ্রান্তে রাজপুরোহিত আচার্য্য বিপ্র-বর্গের আশ্রম, শান্তি ও সৌন্দর্য্যের আবাসভূমি। নন্দিতা সেই প্রশান্ত উদার পরিবেষ্টনীতে রাজপুরোহিতের স্নেহক্রোড়ে সন্তানতুল্য যত্নে পালিতা। তিনিই তাহার পিতার অভাব পূরণ করিয়াছিলেন। মাতাকে তাহার মনে পড়ে না। ভূমিষ্ঠ

হইবার দুইদিন পরেই তাহার মাতা তাঁহার স্নেহের দুলালীকে স্বামীর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। তদবধি তাহার পিতাই একাধারে পিতা ও মাতার স্থান অধিকার করিয়া মাতার অভাব মোচন করিয়াছিলেন, কিন্তু নির্দ্দয় বিধাতা তাহাও রাখিলেন না। মাতাকে সে জ্ঞানে দেখে নাই, পিতার স্মৃতিও অস্পষ্ট ছায়ার মত তাহার মনে উদয় হইয়া মাঝে মাঝে তাহাকে কেবল বিধুর করিয়া তুলে। আজ এই শ্রান্ত প্রকৃতির বিরাম বাসরে তাহার স্নেহশীলা জননী ও স্নেহময় পিতার মুখচ্ছবি তাহার অন্তরকে উদ্বেল করিয়াছিল; হৃদয়ের সঞ্চিত শোক সন্তাপ নিস্পলক নেত্রপথে দর দর ধারে উৎসারিত হইতেছিল।

তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই সন্ধ্যা তিমির অবগুণ্ঠন টানিয়া স্মিত গগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। অকস্মাৎ এক দূরাগত শব্দে নন্দিতা চকিতা হইল। আশ্রমে ফিরিয়া যাইবার সময়ও উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এই আশঙ্কায় উঠিয়া দাঁড়াইল। অশ্বক্ষুরের শব্দ ক্রমশঃ নিকটতর হইতে লাগিল; অস্পষ্ট আলোকে নন্দিতা - দেখিল এক দেবকান্তি পুরুষ অশ্বারোহণে আশ্রমের পথেই আসিতেছে। অশ্বারোহী দূর হইতেই নারীমূর্ত্তি দেখিয়া অশ্ববল্গা আকর্ষণ করিয়াছিল; নিকটে আসিয়া অশ্বকে সংযত করিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে নন্দিতার প্রতি অবলোকন করিল। নন্দিতাও সুদর্শন দেবোপম যুবকের প্রতি বারেক দৃষ্টিপাত করিয়া বদন

অবনমিত করিল। তাহার মনে হইল, এই জনবিরল বনভূমিতে বুঝি কোন দেবদূত আবির্ভূত হইলেন।

বনমধ্যে এই অসামান্যা রূপলাবণ্যময়ী যুবতীকে দেখিয়া অশ্বারোহী যুবক নন্দিতাকে বনদেবী জ্ঞানে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বলিল—"দেবী আপনি কে? আমি পথ হারাইয়াছি। দূর হইতে ঐ ক্ষীণ আলোক লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম এক রাত্রির আশ্রয়ের জন্য। আপনি কে?"

নন্দিতা সলাজ স্নিগ্ধ হাস্যে বলিল—"আমি আশ্রমবাসিনী, ঐ আলো আমাদেরই আশ্রমের। আপনি আসুন, পিতা আপনাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন।"

যুবক তাহার সুমধুর কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল—এ বনবালা কে?

নন্দিতা অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া যুবককে অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিল। যুবক অশ্ববল্গা ধারণ পূর্ব্বক নন্দিতার অনুসরণ করিল। কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া মৃদুকণ্ঠে নন্দিতা জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার পরিচয় জানিতে পারি কি?"

যুবক বলিল—"আমি স্বর্ণগড়ের রাজা নবরতনের একমাত্র পুত্র অরূপরতন। পিতা চরমুখে অবগত হইয়াছেন যে, বিষ্ণুপুরের রাজা সত্বর স্বর্ণগড় আক্রমণ করিবার আয়োজন করিয়াছেন। এই সংবাদে পিতা অত্যন্ত বিচলিত ও উত্তেজিত

হইয়া সামন্তরাজের এই গুপ্ত অভিসন্ধির সমুচিত বিধান করিবার নিমিত্ত আমাকে সেনাপতি করিয়া সৈন্যদল লইয়া বিষ্ণুপুর অভিমুখে পাঠাইয়াছেন। সন্ধ্যা সমাগমের পূর্ব্বে সৈন্যদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নদীতটের শোভা দেখিতে দেখিতে বনে প্রবেশ করিয়া পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। সৈন্যগণের উপর বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হইবার আদেশ আছে, তাহারা আমার অপেক্ষা না করিয়াই তথায় উপস্থিত হইবে।"

নন্দিতা জিজ্ঞাসা করিল—"তাহারা কি রাত্রিকালেও অগ্রসর হইবে?"

রাজপুত্র বলিল—"না, তাহারা নিকটবর্ত্তী কোন প্রান্তরে শিবির স্থাপন পূর্ব্বক রাত্রিযাপন করিয়া পুনরায় অতি প্রত্যুষে যাত্রা করিবে। কল্য আমি পথে তাহাদের সহিত মিলিত হইবার আশাকরি। পিতার আদেশ, আগামী কল্যই যেন আমি সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হই।"

কথা কহিতে কহিতে তাহারা আশ্রমের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; রাজপুত্র আশ্রমের এক বৃক্ষমূলে অশ্বরজ্জু সংলগ্ন করিয়া নন্দিতার পশ্চাৎ সন্তর্পণে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। দীপালোকে অরূপরতন দেখিল মৃগচর্ম্মের উপর উপবিষ্ট দিব্যকান্তি জ্যোতির্ম্ময় ঋষিমূর্ত্তি; শ্বেত শ্মশ্রু ও পক্ককেশরাজী তাঁহার প্রশান্ত গম্ভীর বদনমণ্ডলকে স্বর্গীয়

শ্রী মণ্ডিত করিয়াছে; নিমীলিত নেত্রে স্তব আবৃত্তি করিতেছেন ভক্তিগদগদ জলদ গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে। সম্মুখে নির্ব্বাপিত হোমাগ্নি হইতে চন্দনসুরভিপূরিত ক্ষীণ ধূম্ররাশি, ধূপ ধূনার সহিত মিশ্রিত হইয়া সমস্ত আশ্রম বায়ুকে আমোদিত করিতেছিল। নন্দিতা সেই ঋষিকল্প মূর্ত্তির বিপরীত দিকে উপবেশন করিয়া রাজপুত্রকে বসিতে ইঙ্গিত করিল। অরূপের মনে হইল সে যেন কোন্ পুরাণ কথিত তপোবনে দেবভাবের পরিবেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহার অন্তর ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

আবৃত্তি শেষ হইলে পর নন্দিতা তাঁহার নিকটে আসিয়া অরূপকে দেখাইয়া বলিল—“বাবা, দেখ আজ কাহাকে ধরিয়া আনিয়াছি।”

স্নেহবিজড়িতকণ্ঠে পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কাহাকে ধরিয়া আনিলে মা?”

অরূপ তখন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। পুরোহিত যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। অরূপের বলিবার পূর্ব্বেই নন্দিতা তাহার পরিচয় দিল এবং সমস্ত ঘটনা যেমনটি শুনিয়াছে তাঁহাকে নিবেদন করিল। আশ্রিতের প্রতি নন্দিতার অকপট আন্তরিকতার আভাস পাইয়া তিনি পরম পরিতৃপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন—“মা, তুমি যাহাকে ধরিয়া

আনিয়াছ তাহার পরিচর্য্যার ভার তোমাকেই লইতে হইবে যে!"

নন্দিতার দৃষ্টি আনন্দে ভূতলে লুটাইয়া পড়িল।

আশ্রমে অতিথি অভ্যাগতের জন্য একটি পৃথক প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট ছিল—নন্দিতা তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া অরূপকে ডাকিয়া বলিল—"আপনি রাজ-পুত্র, পালঙ্কের বিলাস-শয়নে আপনার রাত্রিযাপন করা অভ্যাস। কিন্তু আমাদের এই আশ্রমে তৃণশয্যা ভিন্ন আর কিছুই নাই, না জানি আপনার কত কষ্ট হইবে।"

অরূপ বাধা দিয়া বলিল—"আজ যদি এই আশ্রমের সন্ধান না মিলিত তাহা হইলে বোধকরি মুক্ত আকাশের নীচে ঘোর অন্ধকার বনের মধ্যে তৃণশয্যায় শয়ন করিতে হইত—এই সযত্নরচিত সামান্য শয্যা আজ আমার নিকট রাজপালঙ্কের অধিক সুখকর। আপনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না। ভাল কথা, আপনি আমার সমস্ত পরিচয় পাইলেন, কিন্তু আপনার নামটি পর্য্যন্ত এযাবৎ আমি জানিতে পারি নাই।"

নন্দিতা শয্যা মার্জ্জনা করিতে করিতে বলিল—"আমার নাম নন্দিতা। আমিও রাজকুমারী।" বলিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব রহিল।

অরূপ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে কিয়ৎক্ষণ স্থির থাকিয়া

সংযত চিত্তে কহিল—"আপনি রাজকুমারী! তবে বনবাসিনী কেন? আপনার পিতারই বা সন্ন্যাসী হইবার কারণ কি?"

তাহার সহৃদয় অনুনয়ে সরলা নন্দিতা আপনার পূর্ব্ব ইতিহাসের অধ্যায়গুলি একে একে বলিয়া আপনাকে রিক্ত করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। সে ইতিহাস শুনিয়া যুগপৎ বিস্ময় ও দুঃখে অরূপরতন অভিভূত হইল। নন্দিতাকে দেখিবামাত্র তাহার অনুপম সৌন্দর্য্য তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, এখন তাহার দুঃখ তাহার হৃদয়কে অধিকার করিল। দুঃখিনী নন্দিতার প্রতি সে যতই দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল ততই তাহার অন্তঃকরণ সমবেদনা ও সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল; তাহার মন বলিয়া উঠিল—আমি কি ইহাকে সুখী করিতে পারি না?

অরূপকে নীরব হইতে দেখিয়া নন্দিতা জিজ্ঞাসা করিল—"আমি কি আপনাকে ব্যথা দিলাম? কিন্তু কি করিব, ভস্মাচ্ছাদিত ধূমকে একেবারে নিঃশেষ হইয়া জ্বলিতে না দিলে তাহা কখনই নির্ব্বাপিত হইবে না—বারে বারে গুমরিয়া উঠিবে। এই বনমধ্যে আমার সঙ্গী বলিতে কেহ নাই; পিতা সারাদিনই পূজা আহ্নিক লইয়া ব্যস্ত, আমার কথা কহিবার কেহ নাই—নিজের দুঃখের কথা বলিয়া যে শান্তি পাইব এমন একটা লোকও নাই—ইহাতে আমার দুঃখের ভার লাঘব হইবার পথ না পাইয়া যেন দিন দিন

বাড়িয়া যাইতেছে—আজই সন্ধ্যাকালে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া অনেক কাঁদিয়াছি, আপনার নিকট আমার রুদ্ধ আবেগকে সংবরণ করিতে পারিলাম না—ইহাতে আপনি যদি ব্যথিত হইয়া থাকেন, আমি ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।"

অরূপ তাহার সুন্দর হাত দুইখানি ধরিয়া বলিল—"নন্দিতা, তোমার দুঃখের ভাগী হইতে পারিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি, তোমার ব্যথার বোঝা কিয়ৎপরিমাণে লাঘব করিতে পারিয়াছি বলিয়া সত্যই আমি সুখী। আজ হইতে তুমি আমাকে তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বলিয়া জানিও।"

নন্দিতা বাষ্পপূরিত নেত্রে অরূপের দিকে চাহিয়া রহিল। পিতা ভিন্ন এরূপ স্নেহবাক্য ত এপর্য্যন্ত আর কেহ তাহাকে শুনায় নাই! অরূপের সংস্পর্শে আজ সে অন্তরে এক নব জাগরণ উপলব্ধি করিল। সর্ব্বাঙ্গে অব্যক্ত শিহরণ-পুলকে আচম্বিতে সে হাত ছাড়াইয়া বলিয়া উঠিল—"যাই আপনার আহার্য্য লইয়া আসি।"

নন্দিতা চলিয়া গেল, অরূপের চিন্তারাশিও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। সে ভাবিতে লাগিল—এত রূপ এবং এরূপ নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক ও মাধুর্য্যপূর্ণ চরিত্রের সংস্পর্শে সে পূর্ব্বে কখনও আসে নাই; তাহার দুঃখ সে দূর করিবেই। নন্দিতা রাজবংশের কন্যা—রাজকুমারী, তাহাকে অরূপ সচ্ছন্দে

বিবাহ করিতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থির করিল, যুদ্ধ জয়ের পরে এইস্থলে আসিয়া নন্দিতাকে বিবাহ করিয়া স্বদেশে ফিরিবে। ইতঃমধ্যে নন্দিতা একটি মৃৎপাত্রে সযত্ন বিন্যস্ত নানা ফলমূল লইয়া উপস্থিত হইল। অরূপ বলিল—"আমি একাকী এত আহার করিতে পারিব না, তোমাকেও আমার সহিত ভোজন করিতে হইবে। বন্ধুর নিকট লজ্জা করিতে নাই।"

নন্দিতা বলিল—"গৃহান্তরে আমার আহার্য্য আছে আপনাকে ভোজন করাইয়া তবে আমি আহার করিব।" কিন্তু অরূপের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাহাকে বাধ্য হইয়া অরূপের পাত্র হইতে কিছু গ্রহণ করিতে হইল।

তাহার আন্তরিক ব্যবহারে নন্দিতা বিভোর হইয়া ভাবিতে লাগিল—অরূপের স্বভাবটি কি সুন্দর! মাত্র কয়েকঘণ্টার পরিচয়, কিন্তু অরূপ তাহাকে কত আপন করিয়া লইয়াছে—মনে হয় তাহাদের দেখাশোনা আলাপ পরিচয় যেন কতদিনের! ভাবিতে ভাবিতে সে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাকে কলাই যাইতে হইবে—আর কয়েকদিন এখানে থাকিয়া যাওয়া চলে না ?"

অরূপ বলিল—"পিতার আদেশ, বিষ্ণুপুরের রাজার যুদ্ধ-যাত্রার পূর্ব্বেই আমাকে তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইতে হইবে। আমার আর একদিনও অপেক্ষা করিলে চলিবেনা।"

নন্দিতা নিরাশ হইয়া বলিল—"তাহা হইলে হয়ত আর আপনার দর্শন পাইব না।"

অরূপ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"নন্দিতা, যুদ্ধশেষে আমি নিশ্চয় তোমার নিকট আসিব এবং এইস্থানে কয়েক-দিন বিশ্রাম করিব। নন্দিতা, তুমি আমার সহিত আমার দেশে যাইবে?"

বিস্মিত হইয়া নন্দিতা বলিল—"আমি! আপনার সহিত!"

অরূপ সাদরে তাহার হস্তধারণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, আমার সহিত যাইতে তোমার বাধা কিসের নন্দিতা?"

নন্দিতা সরমে সঙ্কুচিতা হইয়া বলিল—"আমি অবিবাহিতা এবং আপনার নিঃসম্পর্কীয়া; আপনার সহিত—"

অরূপ দুই হস্তে তাহার পাণি গ্রহণ করিয়া বলিল—"আমি তোমায় বিবাহ করিলেও কি তুমি নিঃসম্পর্কীয়া থাকিবে নন্দিতা?"

নন্দিতার ব্রীড়াজড়িত দৃষ্টি ভূমিতে নিবদ্ধ হইল।

অরূপ স্থির চিত্তে বলিল—"এই স্থান হইতে আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাইব।"

নন্দিতা বিস্মিত ও লজ্জিত হইয়া তাহার কর যুগল হইতে

হস্ত মুক্ত করিয়া বলিল—"ছিঃ আমি যে বনবাসিনী, আর আপনি রাজার কুমার ?"

"তুমিও ত রাজকুমারী নন্দিতা।"

নন্দিতা সরমে অধোমুখ হইয়া রহিল। অরূপ বলিল—"নন্দিতা, আমার পিতার কোন অমত হইবে না, বরং তোমার মত সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিনী পুত্রবধূ পাইয়া তিনি পরম পরিতুষ্ট হইবেন। বল, ইহাতে তোমার অমত আছে কিনা।"

"অমত ! ইহা যে আমার স্বপ্নের অতীত।" বলিয়া একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"রাত্রি অনেক হইল, বিশ্রাম করুন," বলিয়া নন্দিতা সরম জড়িত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

রাত্রি গভীরতর হইতে লাগিল, চারিদিক নিদ্রায় অচেতন, কেবল দুইটী প্রাণী আপন আপন কক্ষে বিনিদ্র—অরূপ ও নন্দিতা। ভবিষ্যতের নানারূপ সুখকল্পনায় তাহাদের পরস্পরের হৃদয় পুলকরসে পরিপূর্ণ ; সুপ্তি তাহাদের নেত্র হইতে সুখ-স্বপ্ন হরণ করিতে পারিল না।

অতি প্রত্যুষে অরূপরতন বিষ্ণুপুর অভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য উঠিয়া পড়িল। নন্দিতা তাহার পূর্ব্বেই উঠিয়াছিল—অরূপের দ্বারের নিকট আসিয়া দেখিল, সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত। নন্দিতা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এখনি যাইতে হইবে ?"

"এখন না যাত্রা করিলে সময়মত পৌঁছাইতে পারিব না যে নন্দিতা! পিতা কোথায়, চল, তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া আসি।"

"পিতা পূজায় বসিয়াছেন, এখন ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎলাভ হইবে না।"

উপায়ান্তর না দেখিয়া অরূপ বলিল—"তাহা হইলে তাঁহাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইও এবং বলিও আবার আসিব।"

বাহিরে আসিয়া বৃক্ষমূল হইতে অশ্ববল্গা মোচন করিয়া অরূপ বলিল—"নন্দিতা বিদায় দাও।"

নন্দিতার নেত্রপ্রান্তে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া বলিল—"ও কি! তোমার চোখে জল। না না; কাঁদিও না নন্দিতা, আমি ত আবার আসিব। যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিয়া তোমায় লইয়া যাইব। তুমি অশ্রু বিসর্জ্জন করিলে যে অকল্যাণ হইবে নন্দিতা?" বলিয়া স্বহস্তে তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিল।

নন্দিতা চোখ মুছিয়া বলিল—"কিন্তু তুমি কিরূপ থাকিবে তাহা আমি কি করিয়া জানিব?"

অরূপ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল। বল ত নন্দিতা, ঐ যে কুল কুল রবে এই স্থান বেষ্টন করিয়া প্রবাহিতা ঐ নদীটির নাম কি?"

বেদনাজড়িতকণ্ঠে নন্দিতা উত্তর করিল—"সিপ্রা"

বিস্মিত রাজপুত্র বলিল— "সিপ্রা! সিপ্রার তটেই যে বিষ্ণুপুর অবস্থিত নন্দিতা! বিষ্ণুপুরের পার্শ্ব বেষ্টন করিয়াছে যে সিপ্রা!—নন্দিতা, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে যুদ্ধশেষে শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া একগুচ্ছ ফুল আমি ভাসাইয়া দিব তোমার নাম করিয়া। ধীরগতি সিপ্রা তাহা বহিয়া আনিয়া প্রভাতে তোমাকে আমার কুশলবার্ত্তা জানাইবে। নন্দিতা, বিদায় দাও? রণজয়ী হইয়া ফিরিব। কাঁদিও না নন্দিতা; আমি আসিবই।" এই বলিয়া তাহাকে সাদর আলিঙ্গন করিয়া অশ্বারোহন করিয়া বলিল—"রণজয়ী হইয়া ফিরিব নন্দিতা—বিদায়।" কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে রাজপুত্রকে লইয়া অশ্ব বনপথে অদৃশ্য হইল। নন্দিতার দৃষ্টিও অশ্বের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে শূন্যে মিলাইয়া গেল! কিছুকাল গত হইলে পর নন্দিতা বস্ত্রাঞ্চলে চোখের জল মুছিয়া ধীরপদবিক্ষেপে আশ্রমাভিমুখী হইল।

তখন সবেমাত্র ঊষার উদয় হইতেছে—দুই একটি পক্ষী তাহাদের সারারাত্রির বিশ্রামজনিত জড়িমা দূর করিবার জন্য কুলায় মাঝে মাঝে পক্ষ সঞ্চালন করিতেছিল। নিথর প্রকৃতির মাঝে তাহারই শব্দ জাগরণের ইঙ্গিত করিতে-ছিল। পূর্ব্ব গগনপ্রান্তে তরুণ তপনের আগমন বার্ত্তা তখনও স্পষ্ট হয় নাই। নন্দিতা তখন নদীকূলে সেই

কালো পাথরের উপর বসিয়া নদীবক্ষে স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কাহার ধ্যান করিতেছিল কেহ জানে না। ক্রমে ক্রমে বিশ্বচরাচর জাগিয়া উঠিল—নন্দিতা উঠিল না—বহুক্ষণ কাটিয়া গেল।

দিন কাটিয়া গেল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাজালের মধ্য দিয়া। আচার্যদেব নন্দিতার ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন এবং উহার কারণও বুঝিতে পারিলেন। সরলা নন্দিতার মনের কথা জানিতে গুরুদেবের সময় লাগিল না এবং যখন শুনিলেন—অরূপ যুদ্ধশেষে ফিরিয়া আসিয়া নন্দিতাকে বিবাহ করিয়া স্বদেশে ফিরিবার সঙ্কল্প করিয়া গিয়াছে তখন তিনি পরম আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন—"ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি অরূপ জয়যুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসুক। মা নন্দিতা, সেদিন আমার কি সুখের দিন হইবে যদি অরূপের ন্যায় যোগ্যপাত্রে তোমায় সমর্পণ করিতে পারি তাহা হইলে তোমার স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছাপূর্ণ করিতে পারিব।"

নন্দিতার রাত্রি কাটিয়া গেল আশা নিরাশার জাল বুনিয়া —সে ঘুমাইতে পারিল না—কখন ভোর হইবে তাহার কেবল এই চিন্তা। বিনিদ্র অবস্থায় সে কত কি ভাবিতে লাগিল—অরূপ কি এখন ঘুমাইতেছে? সে কি তাহারই মত বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছে, অরূপ আবার আসিবে, তাহাকে বিবাহ করিবে, সে তাহাদের রাজ্যে ফিরিয়া যাইবে—

অরূপের পিতামাতা তাহাকে দেখিয়া কি বলিবেন ? তাঁহারা এই বনবাসিনীকে স্নেহ করিবেন কি ? সে তাহার যথা-সর্ব্বস্ব দিয়া অরূপকে সুখী করিবার চেষ্টা করিবে।

কল্পনার রথ বাধা না পাইলে তাহার গতির শেষ নাই —নন্দিতার রঙীন মনোরথ সহসা পাখীর কলরবে বাধা না পাইলে আরও চলিত। পূর্ব্বাকাশে রক্তিম আভা অবলোকন করিয়া নন্দিতা শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িল এবং দ্রুতপদে নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ যে এক গুচ্ছ শ্বেতকমল নদীর চরে বাঁকের মুখে বিশ্রাম করিতেছে—ঐ ত অরূপের কুশলবাহী দূত। ফুলের মুখে হাসি! নন্দিতা ছুটিয়া গিয়া কমলগুচ্ছ পরম যত্নে তুলিয়া লইল—সস্নেহে তাহাকে গৃহে লইয়া আসিল। ফুলের মুখে দেখিতে পাইল অরূপের হাসি, তাহার স্পর্শে পাইল অরূপের অন্তরের একান্ত আভাস; তাহার সৌরভে নন্দিতা পাইল অরূপের সান্ত্বনা। নন্দিতা কমলগুচ্ছে আপনাকে বিলাইয়া দিল।

এমনি করিয়া প্রতিদিন প্রত্যূষে সিপ্রার তীরে একটি করিয়া শ্বেতপদ্মের গুচ্ছ নন্দিতাকে অরূপের কুশলবার্ত্তা আনিয়া দেয়। নন্দিতার দিনও পরম তৃপ্তিতে কাটিয়া যায়।

সেদিনও ভোর হইতে না হইতে নন্দিতা ছুটিল নদীর তীরে—কিন্তু কই! ফুল কই! ফুল কই! চারিদিকে

ব্যাকুলব্যগ্র দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিল, কিন্তু বার্ত্তাবহ শ্বেত-কমলদেলর সন্ধান পাইল না। তবে কি! নাঃ সে ভাবিতেও পারে না। তাহার হৃদয় গুমরিয়া উঠিল—অরূপের অকল্যাণের কথা কল্পনা করিতেও তাহার হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। নন্দিতা নদীতীরে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সেই বিষাদময় করুণ ক্রন্দন শুনিয়া সিপ্রা চমকিয়া উঠিল—তাহার মুক ভাষায় বলিয়া উঠিল—হায় অভাগিনী নারী! তোমার রঙীন্ স্বপ্ন চিরতরে বিলুপ্ত হইল, তোমার সোনার রথ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল!

বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিবার পর আত্মসংবরণ করিয়া ভাবিল, ছিঃ, সে এ কি করিতেছে, অরূপের অকল্যাণের কথা ভাবিতেছে কেন? হয়ত স্রোতের প্রাবল্যে পদ্মফুলগুলি এখান হইতে বহুপূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছে; নতুবা পথে কোন কারণে বাধা পাইয়া থাকিবে। এই ভাবে মনকে প্রবোধ দিয়া নন্দিতা অবসন্ন শ্রান্ত মনে আশ্রমে ফিরিল।

আজ আর সে কোন কাজেই মনঃসংযোগ করিতে পারিল না—প্রতি মুহূর্ত্তেই এক অজ্ঞাত আশঙ্কা আসিয়া তাহাকে সন্ত্রস্ত করিতে লাগিল। তাহার অন্তর থাকিয়া থাকিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া শূন্যে বিলীন হইতে চাহিল। গুরুদেব তাহা লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"নন্দিতা মা, শরীর কি অসুস্থ বোধ করিতেছ?" নন্দিতা মুখে হাসি টানিয়া

আনিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল—"না পিতা, আমি ভালই আছি।"

দুঃখে বেদনায় সিক্ত করুণ দিবস বিদায় লইল, করুণতর সন্ধ্যার অন্ধকারের ক্রোড়ে নন্দিতাকে সমর্পণ করিয়া। রাত্রির সৌন্দর্য্য উন্মোচন করিয়াও নন্দিতাকে শান্ত করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছিল সন্ধ্যা।

নন্দিতা আশ্রমদ্বারে একাকী অধোমুখে বসিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছে—অকস্মাৎ দ্রুত অশ্বক্ষুরের শব্দ শ্রবণ করিল—তাহার হৃদয় আনন্দে দুলিয়া উঠিল—অরূপ যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিতেছে! সে ছুটিয়া আশ্রম পথে আসিয়া উপস্থিত হইল। অস্পষ্ট আলোকে দেখিতে পাইল এক অশ্বারোহী আশ্রমাভিমুখে আসিতেছে। নিকটে আসিয়া অশ্বারোহী নন্দিতাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ইহা কি আচার্য্য বিপ্রবর্ণের আশ্রম?"

"হাঁ ইহা আচার্য্য বিপ্রবর্ণের আশ্রম।" বলিয়া নন্দিতা অশ্বারোহীর প্রতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। এ কি? শিহরিয়া উঠিল নন্দিতা। অশ্বারোহীর পার্শ্বদেশে আবদ্ধ অসাড় দেহ কাহার?

"আমি বিষ্ণুপুর হইতে আসিয়াছি" বলিয়া অশ্বারোহী সেই স্পন্দনহীন দেহ স্কন্ধে লইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া নন্দিতার সম্মুখে দাঁড়াইল। তারকারাজির অস্পষ্ট আলোকে

নন্দিতা দেখিল যুবকের স্কন্ধে অরূপ—নিস্পন্দ। যুবক প্রশ্ন করিল—"আপনার নাম কি—নন্দিতা ?"

অতিকষ্টে অন্তরের ক্রন্দনাবেগ সংযত করিয়া নন্দিতা ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল—"হঁা।"

যুবক তাহার সম্মুখে সেই আশ্রমের আঙ্গিনায় অরূপের প্রাণহীন দেহ অতি যত্নে স্থাপন করিয়া বলিল—"যুবরাজের শেষ অভিলাষ—"

ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় নন্দিতা মৃতদেহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার কাতর ক্রন্দন সমস্ত আশ্রমকে কাঁদাইয়া আকাশকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। বাতাস দিকে দিকে নন্দিতার মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ বহন করিয়া বারে বারে সমস্ত বিশ্বকে ব্যথিত করিতে লাগিল।

সে করুণ যামিনীও অতিবাহিত হইয়াছিল। সূর্য্য যেমন, তেমনই পরদিন প্রভাতে উদিত হইয়াছিল কিন্তু পূর্ব্বের নন্দিতাকে ফিরাইয়া আনিতে পারে নাই।

আশ্রমের লতাকুঞ্জের পার্শ্বে যে স্থানটি এক সময় নন্দিতার পরম রমণীয় বোধ হইত, এখন সেই স্থানে একটি শুভ্র প্রস্তরের বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার উপর শ্বেত প্রস্তরের একটি অর্দ্ধোস্ফুট পদ্ম অরূপের প্রতীকরূপে বিরাজ করিতেছে। প্রভাতের আবাহনী গানে জগৎ মুখরিত হইয়া উঠিলে, সেই বেদীমূলে নন্দিতা ধ্যানরতা—মহাযোগিনী

গৌরীর ন্যায় তাহার রুক্ষ কেশ, পরনে গৈরিক বসন—তাহার সেই যৌবন প্রসূত চপলতা নাই—ধীর স্থির সংযত মূর্ত্তি, মুখমণ্ডল মহান্ শান্তির জ্যোতিতে উজ্জ্বল। ঐ শুভ্র শ্বেতকমলের মধ্যেই নন্দিতা অরূপের সুন্দর পবিত্র মুখচ্ছবি দেখিতে পায়, তাহার সরল সুন্দর দলগুলিতে জড়িত রহিয়াছে অরূপের বিশুদ্ধ হৃদয়ের অম্লান আলোক, মিলনের আশ্বাস।

এমনি করিয়া শ্বেতপদ্মের ধ্যানেই যোগিনী নন্দিতার দিন কাটিয়া যায়।

কতদিন যে এই ভাবে কাটিয়াছিল জানা নাই। আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেই বেদীর উপর শুভ্র সুন্দর মর্ম্মর নির্ম্মিত সেই অর্দ্ধোস্ফুট কমলের পার্শ্বে একটী লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত অর্দ্ধোন্মিলীত চারু কমলিনীর স্থান হইল। নানা সুগন্ধ পুষ্পে বেদীটী সুশোভিত ; ধূপ, ধূনা, চন্দন সুরভিতে আমোদিত।

স্থবির আচার্য্যদেব জরা-কম্পিত হস্তে প্রদীপটী লইয়া কমলযুগলকে আরতি করিতে করিতে ক্রন্দনাবেগে উচ্ছলিত জলদ গম্ভীর কম্প্র-কণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন—

ছায়ালীনং ভুবনকমলং ধ্যানলীনঞ্চ শূন্যম্
শান্তালাপা মুখরধরণী প্রেমকান্তং চ বিশ্বম্
ভাগ্যভ্রষ্টং কমলযুগলং মৃত্যুতীর্থ প্রতীর্ণম্
নিত্যজ্যোতির্য়তু মধুরং শাশ্বতানন্দলোকম্।

সারা আশ্রমকে চঞ্চল করিয়া সেই ধ্বনি কাঁপিতে কাঁপিতে অনন্তে বিলীন হইল। সহসা জীবন-পথ শ্রান্ত বৃদ্ধ বিপ্রবর্ণের দেহ বেদীমূলে লুটাইয়া পড়িল। আশ্রম বায়ু হায় হায় করিয়া বনস্থলীর অন্তর বিদীর্ণ করিতে করিতে দিগন্তের পানে ছুটিয়া চলিল।

রজনী রোদন করিতে লাগিল—।

সুরের স্বপ্ন

আজ অনিতার ঘুম ভাঙ্‌লো সানাইয়ের করুণ আলাপে। বৈশাখের স্বচ্ছ প্রভাত। পাড়ার এক বিয়ে বাড়ীর আনন্দের সংবাদ বহন ক'রে ফুর-ফুরে বাতাসে দূর দূরান্তরে ভেসে যাবার পথে অনিতাকে জাগিয়ে দিয়ে গেল সেই সানাইয়ের করুণ সুর। সেই করুণ রাগিণী শুন্‌তে শুন্‌তে অনিতা তার অনেকদিনের ফেলে-আসা দিনগুলোর মাঝে গিয়ে পড়ে।

সেদিনও বৈশাখের এমনি এক স্নিগ্ধ প্রভাতে তাদের বাড়ীতে সানাই বেজেছিল। সেদিনও আকাশ এমনি মেঘমুক্ত ছিল; নির্জ্জন পথচারী আপন-ভোলা বাউলের মতো কেবল দু'একটা সাদা মেঘের ভেলা সেই নীল সমুদ্রে পাড়ি জমাচ্ছিল। চারি-দিকে লোকজন—কতো কাজ—কতো ব্যস্ততা; সকলেই হর্ষ চঞ্চল—বড়োদের হাঁক ডাক আর ছোটদের আনন্দ কোলাহলে উৎসব প্রাঙ্গণ মুখরিত।

অনিতার বেশ মনে পড়ে—সেদিন সে একটুও সুখী হ'তে পারে নি; তার কোনোরকম আনন্দ হয়নি সে-দিন। কেঁদে কেঁদে তার চোখের জল গিয়েছিল শুকিয়ে। কতো অনুনয় বিনয়—কিন্তু কে তা শুন্‌বে! সে যে বাঙ্গালীঘরের মেয়ে হ'য়ে জন্মেছে—নিজের উপর যে তার কোনো অধিকার নেই,

তাই আজ তার নিজের সুখকে প্রাণহীন মূঢ় সমাজের জন্য চিরতরে বিসর্জ্জন দিতে হ'চ্ছে।

বিয়ের দিন স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনিতা নিজের মনকে নূতন সুরে বাঁধবার চেষ্টা ক'রেও এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হ'তে পারে নি : প্রতি মুহূর্ত্তেই পুরাতনের প্রতিধ্বনিতে তার অন্তর ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে—কিছুতেই সে তার সাথী অলোককে ভুল্‌তে পারে না! ছোটবেলা থেকে অজ্ঞাতে অনবধানে ক্রমে ক্রমে যে বাঁধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হ'য়ে উঠেছে, একদিনের বাহ্য অনুষ্ঠানে অন্তরের সে সুদৃঢ় গ্রন্থি শিথিল হবে কি ক'রে! সে জান্‌তো অলোকের সঙ্গে তার মিলন অসম্ভব—সমাজ কিছুতেই অনুমোদন ক'রবে না ; তাই তার সেই স্মৃতিটুকুই হবে তার' চলার পথের অফুরন্ত পাথেয়। নাই বা পেল তাকে ; পাওয়ার আনন্দ তো পেলেই শেষ হ'য়ে গেল, কিন্তু না-পাওয়ার আনন্দ যে চিরকালের অটুট সুখ! ফুল গাছে থাক্‌লেই তো সুন্দর, কাছে পাবার আশায় বৃন্তচ্যুত করিলেই যে তার সমস্ত সৌন্দর্য্য ম্লান হয়ে যায়। থাক সে দূরে, দূর থেকেই সে শোভাময় ; প্রাণের আনন্দ দূর থেকেই তার অন্তরে সঞ্চার করা যায়। যাকে সে জীবনে স্বেচ্ছায় কিছু দিতে পারবে না, সেখানে একটা জীবনকে দাবীর আঘাতে নষ্ট ক'রে লাভ কি, সেই অকল্পিত জনের সঙ্গে গোঁজামিল দিয়ে! কিন্তু কে শুন্‌বে তার কথা! তাই সেদিনও এমনি বাজনায় তার অন্তরের

অস্ফুট বিলাপ ধ্বনিকে চাপা দিয়ে সুশান্ত এসেছিল তাকে চিরকালের জন্য নিজের ক'রে নেওয়ার বাসনা নিয়ে। সে কেমন করে জানবে যে তার পূজার ফুল আর এক বেদীতে আগেই উৎসর্গ করা হ'য়ে গেছে। অনিতা বিয়ের দিন বিরস বদনে ব'সে থাকে দেখে কেউ বা রাগ ক'রে তাকে বলে—"বিয়ের দিন এমন গম্ভীর হ'য়ে থাকতে নেই।"

বৃদ্ধারা বোঝান—"এতে তোর বরের অকল্যাণ হবে।"

কেউ কেউ টিপ্‌পনী দেয়—"কলেজে-পড়া মেয়েদের এই সব ন্যাকামী একেবারেই সহ্য হয় না।" এমনি কতো কথা! কিন্তু অনিতার মুখে হাসিও ফোটে না—ভাবও বদলায় না। মালা বদলের সময় এলো, সুশান্তের মালা তার মনের কথা নিয়ে অনিতার গলায় জড়িয়ে গেল—কিন্তু অনিতার মালা তার হাত থেকে প'ড়ে গেল মাটিতে। তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে অনিতার হাত ধ'রে তার দাদা পরিয়ে দিল সুশান্তর গলায়। অনিতার মনে পড়ে—শুভদৃষ্টির সময় সে তার স্বামীর সলাজ সুন্দর দৃষ্টির বিনিময়ে দিয়েছিল তার অন্তর্বেদনাতুর অসাড় আঁখির কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু!

বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ীতে অনিতার উদাস দিনগুলো এক এক ক'রে কেটে যায়, সুশান্তর ভুলও একটু একটু ক'রে ভাঙতে থাকে। ক্রমে সে জানতে পারে অনিতার অন্তরে তার ঠাঁই নাই, তার একান্ত অন্তরের বিনিময়েও সে অনিতার মন

পাবার অধিকারী নয়। নিজের উপর ধিক্কারে সে চঞ্চল হ'য়ে অনিতাকে ব'লে ফেলে—"কেন তুমি আগে জানাও নি? তাহ'লে হয়ত তোমার জীবনে আমি দুঃখের বোঝা বাড়াতাম না।"

অনিতার উপর তার কিছুমাত্র রাগ নেই, আছে অভিমান; তার ব্যর্থ জীবনকে আরও বেদনা-মলিন করবার নিমিত্ত সে, এই হ'ল তার দুঃখ, যা সে কিছুতেই লাঘব ক'রতে পারবে না। অনুপায় দেখে সুশান্ত অনিতার মনের বাঞ্ছিত পথ থেকে আপনাকে সরিয়ে নেয়, তাকে তার হারানো দিনের সুখের স্মৃতি ধ্যান করবার অখণ্ড অবকাশ দিয়ে। অনিতা বর্ত্তমানের সজীব সুন্দরকে ছেড়ে অতীতের শবকে আঁকড়ে অশ্রুমোচন ক'রে আনন্দ পায়।

বিয়ের পর চার মাস কেটে গেল এমনি পাওয়া-হারানোর দোলায়। হঠাৎ একদিন তার মা'র খুব অসুখের সংবাদে অনিতা এল বাপের বাড়ী তার মাকে দেখ্তে। মেয়ের সেবায় মা ক্রমশঃ সুস্থ হ'তে লাগ্লেন। এই সময় একদিন অকস্মাৎ সুশান্তর মৃত্যু সংবাদ এসে অনিতাকে তীব্র-তড়িৎ-প্রবাহের মতো প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে অবস ক'রে দিল। নিজে গাড়ী হাঁকিয়ে অফিসে যাবার পথে মোটর দুর্ঘটনার ফলে হাঁসপাতালে সুশান্ত মারা গেছে—দুর্ঘটনার ঘণ্টা খানেকের মধ্যে। খবর শুনে তার মনের ভাব কি হ'য়েছিল আজ সে তা স্মরণ ক'রতে পারছে না।

সেদিন তার চোখে জলও ছিল না, অন্তরে বেদনা অনুভব করবার ক্ষমতাও সে হারিয়ে ফেলেছিল—মন অসাড় হ'য়ে গিছ্‌লো। তবে সেই দিনই সে বুঝ্‌তে পেরেছিল যে আজ থেকে সে একা। জগতে তার হাত ধরবার কেউ নেই, পথ দেখাবার কেউ নেই। যা পেয়েছিল, নিজের অবহেলাতেই তা হারিয়েছে, যা গ'ড়েছিল, নিজের হাতেই তা ভেঙেছে, তার বাসের গৃহকে সে যে নিজের ইচ্ছাতেই নিস্তব্ধ সমাধিস্থল ক'রে তুল্‌লো। আজ যেন সে তার সব পুঁজি খুইয়ে রিক্ত জুয়াড়ীর মতো ঘরে ফিরছে দুরন্ত নিরবলম্বন মন নিয়ে।

এক এক ক'রে অনিতার মনে প'ড়তে লাগ্‌লো সুশান্তর কথাগুলো—তার বিমর্ষ অনুনয়, তার ব্যর্থ অনুরোধ, তার বিফল প্রেম, ভালোবাসা পাবার একান্ত চেষ্টা, আর তাকে সুখী করবার নিষ্ফল প্রয়াসের কথা। যখন সুশান্ত বেঁচেছিল, সে তো একদিনও তার কথা ভাবে নি, কিন্তু আজ কেন তবে রাজ্যের চিন্তা এসে তার মনকে তোলপাড় ক'রে তোলে? কেন আজ সে নিজেকে যারপরনাই অসহায় অনুভব করে, কেন মনে হয়—জগতে তার কেউ নেই? সে আর ভাব্‌তে পারে না—তার ভুল ভেঙে যায়, মনে পড়ে, সে সুশান্তকে হতাশা ছাড়া কিছুই দিতে পারে নি। সে ভাবে—নারী হ'য়ে সে এমন কঠোর হ'লো কেমন ক'রে? এমন নির্ম্মম পীড়নে একটা সুন্দর জীবনকে হেলায় নষ্ট ক'রলো কি ক'রে? তার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কি করে? সে

যে অতি নিষ্ঠুর, অতি কৃতঘ্ন; তার অপরাধের কি মার্জ্জনা আছে? ভুল যখন ভাঙে, উপায়ও যে অনেক দূরে স'রে যায়। এতদিনের রুদ্ধ অভিমান তার অশ্রু নির্ঝরে ঝরতে লাগ্‌লো অবিরল—উদ্দেশ্যবিহীন! বহুদিন পরে আজ তার মনে সন্দেহ হয়—সুশান্তর মৃত্যুটা দুর্ঘটনাজনিত, না তার স্বেচ্ছাকৃত অব্যাহতি লাভ; অনিতা কিছুই ঠিক ক'রতে পারে না।

শোকের দম্‌কা আঘাতে অনিতার মা'র জীবনতরী দিকভ্রষ্ট হ'য়ে পরপারে গিয়ে ভিড়লো। অনিতার বাবা প্রথমটা খুবই দ'মে গিছ্‌লেন, ক্রমে ক্রমে মন্‌কে শক্ত ক'রে বেঁধে নিয়ে নূতন ক'রে সংসারের দিকে মন দিলেন। একে একে বছর ঘুরে যায়, অনিতা তার ব্যর্থ জীবনকে লেখাপড়ার রাজ্যে ছড়িয়ে দিয়ে সমস্ত বেদনাকে ভোলবার চেষ্টা করে। সে এক এক করে এম্‌-এ পর্য্যন্ত পাশ ক'রলো। তারপর তার বাবাকে জানালো যে, সে চুপচাপ ব'সে থাক্‌তে পারবে না—কাজ ক'রবে। সে নিজের দোষের কথা এখনও ভুলতে পারে নি, পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনও যে তার হয় নি। নিজেকে নানাকাজে লিপ্ত না রাখ্‌লে তার অতীতের স্মৃতিগুলো শতসহস্র বৃশ্চিক দংশনে তাকে যন্ত্রণা দেয়—তার জীবন দুর্বিসহ ক'রে তোলে। অনিতাকে দেখে তার বাবার দুঃখ হয়—একি তাঁর সেই আদরের অনিতা! আজ তার কি হৃদয়বিদারক করুণ পরিবর্ত্তন! কোথায় গেল তার

সেই অনাবিল রূপ, কোথায় গেল তার সেই অতুল লাবণ্য, তার সে সহজাত হাসি কোথায়, সে সরল চপলতা কোথায়, যার জন্যে একটুতেই সে সকলের প্রিয় হ'য়ে উঠ্‌তো! তার চোখে জল আসে, আর ভাব্‌তে পারেন না।

অনিতা জোর ক'রে বাবার মত করিয়ে নিল—একটা স্কুলে কাজ পেয়েছে, সে তাই ক'রবে। তবুও সারাদিন নিজেকে কাজের মধ্যে অনেকটা ভুলিয়ে রাখে। কিন্তু একলা থাক্‌লেই তার বুকের মধ্যে হাহাকার ক'রে ওঠে। আজ আবার সেই পুরাণো দিনের মতো সানাই বাজছে। অনিতা চুপচাপ ব'সে ব'সে হঠাৎ কেঁদে উঠে বলে—"ওগো, তুমি ফিরে এস, আজ আর সেই নিষ্ঠুর অনিতা নেই—সে মরেছে। আজ সে সত্যই বুঝেছে--সে তোমার, সে আর কারুর নয়, যা কোনোদিন সে তোমাকে দিতে পারে নি আজ তার সব উজাড় ক'রে তোমার পায়ে ঢেলে দেবে— সব বেদনার জ্বালা মুছিয়ে দিয়ে নূতন ক'রে তোমার গলায় মালা দেবে—আজ এই সানাইয়ের সুরে নূতন ক'রে আবার আমাদের মিলন হবে—যুগ যুগ ধরে সে বন্ধন অটুট থাক্‌বে, কিছুতেই সে গ্রন্থি শিথিল হ'তে দেবোনা। ওগো, তুমি ফিরে এস…।"

অনিতার চমক ভাঙ্গে তার ছোটবোনের ডাকে—"দিদি, তোমার যে স্কুলের বেলা হ'য়ে গেল।"

সে চকিত হ'যে উঠে পড়ে। তাব বোনের দৃষ্টিব অন্তরালে চোখেব জল মুছে নিযে সহজভাবে ব'ল্‌বার চেষ্টা কবে—"বলিস্ কিবে, আজ এত ঘুমিযে প'ড়েছি।"

বিযে বাড়াব সানাইযেব করুণ সুব তখনো তাব হৃদয তন্ত্রীতে আঘাত ক'বে বাতাসে ভেসে যায।

সমাপ্ত